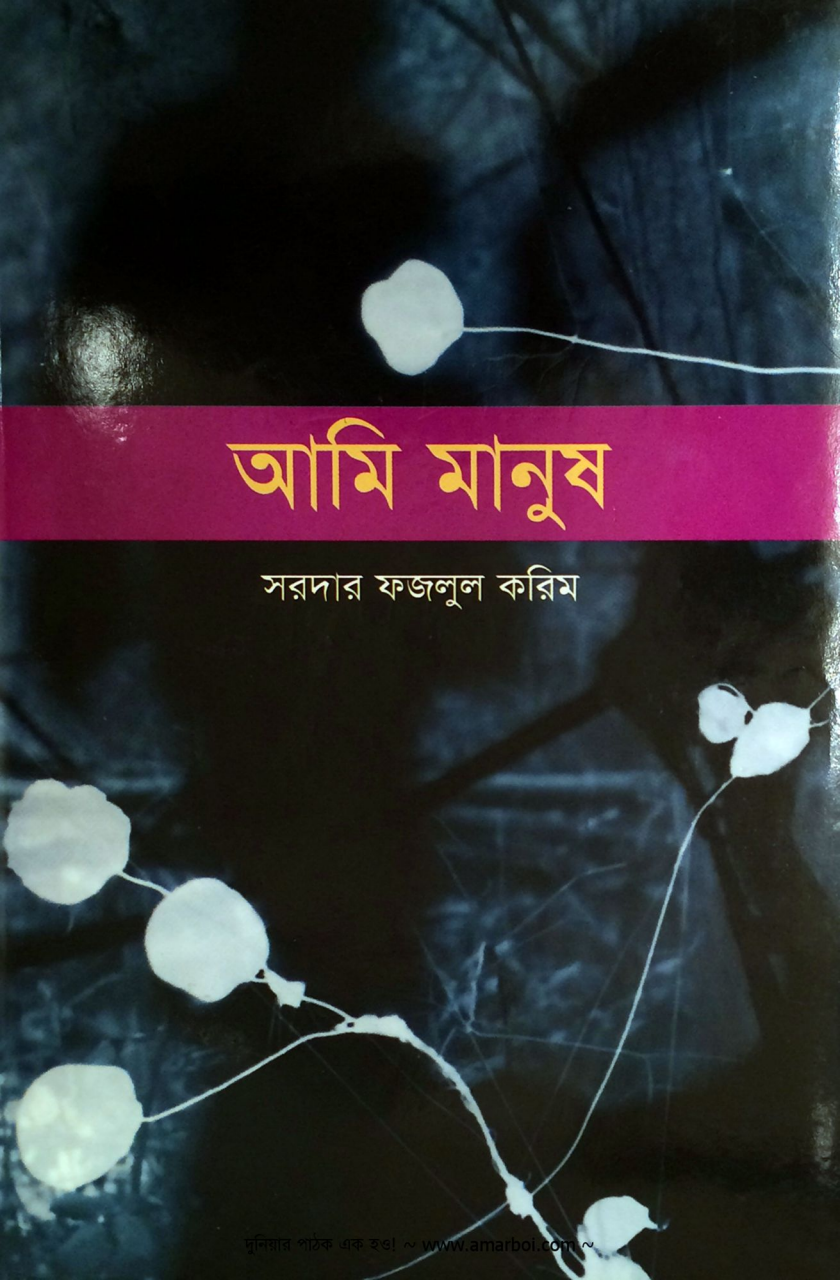

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কেন মানুষ? তার মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা চেতনা থেকেই তো উদ্‌গত হয়। মানুষের নৈতিক ব্যবহারবিধিতে এসব গুণ প্রকাশিত। মূল্যবোধ ও চেতনার যে পরিশীলিত ব্যবহার– তাই মানুষকে মানুষ করে তোলে।

'আমি মানুষ' বইটিতে মানুষ হিসেবে নিজস্ব দার্শনিকতার স্থান দিয়েছেন সরদার ফজলুল করিম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে মর্মার্থ উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন সমাজের চিত্রাবলি।

যতটা সহজে জীবনকে বিশ্লেষণ করা যায়, যতটা সহজে যাপনের চিত্র এঁকে অনন্য উদাহরণ হিসেবে মানুষের জন্য উপযুক্ত করে তোলা যায়– গ্রন্থটি তারই একটি অপরিহার্য উদাহরণ।

'আমি মানুষ' গ্রন্থটি মূলত মানুষ হিসেবে সরদার ফজলুল করিমের নিজস্ব চেতনালব্ধ দার্শনিক কথা, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নিজ জীবনের মতোই আরেক জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরদার ফজলুল করিম ১৯২৫ সালের ১ মে বরিশালের আটিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : খবিরউদ্দীন সরদার। শিক্ষা : মাধ্যমিক, বরিশাল জিলা স্কুল (১৯৪০); উচ্চমাধ্যমিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৪২); স্নাতক সম্মান (দর্শন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণ বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ, বাংলা একাডেমী (১৯৬০-১৯৭১)। সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২-১৯৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দর্শনকোষ, প্লেটোর সংলাপ, প্লেটোর রিপাবলিক, এ্যারিস্টটলের পলিটিক্স, এঙ্গেলস-এর এ্যান্টিডুরিং, নানা কথা, নানা কথার পরের কথা, রুমীর আম্মা, নূহের কিশতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, চল্লিশের দশকের ঢাকা, গল্পের গল্প, যুক্তিবিদ্যা, সেই সে কাল: কিছু স্মৃতি কিছু কথা, ইতিহাস কোষ, আমাদের সাহিত্য ইত্যাদি। পুরস্কার; বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭)। স্বাধীনতা পদক (শিক্ষা) ২০০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মানুষ

সরদার ফজলুল করিম

কথাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কি মানুষ? যখন এ প্রশ্নের আমি কোন জবাব দিতে পারছিলাম না, সেই লা-জবাবের কারণে, নিজেই হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম, তখন আমার এক স্নেহাস্পদ কয়েকটি শিরোনামের মুদ্রণ আমার চোখের সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই শিরোনামগুলোকে আপনি কি স্বীকার করেন না? আমি শিরোনাম কয়টির দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় স্নেহাস্পদকে বলেছিলাম: তুমি আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলে। তোমাকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার জীবন দিয়ে।

সরদার ফজলুল করিম
২৫. ১২. ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

আমি মানুষ ১১
হ্যাঁ, মানুষ, মানুষের জন্য ১৩
আড়াই হাজার বছর বয়সী এক বৃদ্ধের উক্তি ১৬
সহজ সরল সত্য কথা ১৯
সত্য কথার একটি কথামালা ২৪
'৭১-এর আলামত? ২৮
নাই কাজ, তো খৈ ভাজ ৩১
আমাদের দেয়াল ক্যালেন্ডারের সংস্কৃতি ৩৪
ব্যাংকের টেবিলে রবীন্দ্রনাথ ৩৮
এই তো জীবন, যতদিন ততদিন ৪১
সুন্দরের সংগ্রাম ৪৫
একটি দিনের পদ্য ৪৮
মানুষের উপায় কী বল ৫১
আমেরিকা বনাম মুসলিম বিশ্ব ৫৬
তবুও মৃত্যুরই মরণ ঘটবে ৬০
বিচারপতিও অসুস্থ হয়ে পড়েন ৬৪
সত্যি সেলুকাস! ৬৮
পেন্টাগন, সিআইএ; কি বস্তু? ৭১
কোন মহৎ শিল্পীরই মৃত্যু নেই ৭৩
ত্রিশ হাজার বছর পরে ৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মানুষ

ক্যালেন্ডার আর বার মিলিয়ে দেখলাম, আজ ২৬ মে এবং সোমবার। আজ টিকাটুলি সেন্ট্রাল উইমেনস-এ যাওয়ার দিন। না যেতে পারলে আমারই মন খারাপ লাগবে!

গতরাতে রনোর বাসায় আড্ডা ভাল জমেছিল।

আজ এই সকাল ন'টায় কিছু টুকিটাকি নোট করতে গিয়ে মনে হল যেন, মাথাটা ঘুরছে। আমি নিজেকে বললাম : দেশ আর বিশ্বের পরিস্থিতিতে মাথা ঘুরবে না তো পা ঘুরবে? সেটা হাই প্রেসারে, না লো প্রেসারে, সে উদ্বেগে লাভ কি? গতরাতে সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরলেও তখনো বিবিসির শেষ অধিবেশনটার কিছু পেয়েছিলাম। কাগজের মত বিবিসির আলোচনাতেও কাজী নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলীর শব্দ ছিল। নজরুলের কবিতা ও গানের কিছু উদ্ধৃতি ছিল। প্রথম দিকে ঢাকার, পরের দিকে কোলকাতারও। কোলকাতার শ্রদ্ধা-স্মৃতিটি অধিকতর আন্তরিক বলে বোধ হল।

ঢাকারই একটি গানের উদ্ধৃতিতে সেই বিখ্যাত গান ও কবিতাটি এল : 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। গানের প্রথম দুটি চরণের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর আবেগময় জায়গাটিতে গানটি কেটে গেল। সে কি ঢাকার, না কোলকাতার বুঝতে পারলাম না। আমি কোন কবিতাই মুখস্থ রাখতে পারিনে। গান তো আরো। সবটুকু মনে ভাসে তো কথা জাগে না। কিন্তু আমার প্রাণের মানুষ নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-এর অমর উচ্চারণটিকে আমি আমার মনের গভীরে ধারণ করে রাখার চেষ্টা করি। সে নজরুলের জন্য নয়। আমার জীবনের জন্য। বিবিসির ধারাভাষ্যে সেই উচ্চারণটি না পেয়ে হাতের কাছের 'সঞ্চিতা'খানির সূচিপত্র থেকে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'টি বার করে গান, তথা কবিতাটি আবার পড়লাম। এক এক জনের কাছে এক এক বিচার। আমার কাছে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' হচ্ছে আমার জীবনের, আমার বোধের সর্বোত্তম পাওনা, সর্বোত্তম উচ্চারণ :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
হিন্দু, না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলই আমায় স্মরণ করিয়ে দিল, গত পরশুর মগবাজারে বৃষ্টির মাঝে তরিতরকারির বাজারের সেই মেয়েটির কথা।

একটি তরকারির দোকানে একটু নিরাপদ ভেবে হাতের লাঠিটা দোকানে ঠেকিয়ে রেখে একটু বয়স্ক হাসিমুখ দোকানীকে বললাম : একটু জিনিষ দেন। দোকানী বললেন : বলেন সাহেব।

আমি লেবু, শশা, কাঁচা আম ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, পাশে একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার ভাবভঙ্গী দেখে জিজ্ঞেস করল : চাচা আপনি হিন্দু? আমি অবাক হলাম না। আমি বললাম : 'আমি মানুষ'। মেয়েটি, একটু বয়স হয়েছে, হয়ত ও কোন গার্মেন্টসে কাজও করছে। আমার জবাবে ও মজা পেল। আবার প্রশ্ন করল : আপনি চাচা মুসলমান? আমি আবার বললাম : 'মানুষ'। এবার তার মজা আরো বেড়ে গেল। দোকানীকে সম্বোধন করে বলল : দেখছেন নি! উনি হিন্দুও না, মুসলমানও না। উনি 'মানুষ'।

দোকানীটিকে আমার অসম্ভব ভাল লাগল। মেয়েটির মজার প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। আমি বললাম : শশা দেন আধা কেজি আর লেবু দেন এক হালি। শশা আর লেবুর ডালাটি আমার হাতের কাছেই। মেয়েটি আমাকে সাহায্য করতে লাগল লেবু আর শশা বেছে দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে। মেয়েটির প্রশ্নটিকে আমার মনের মধ্যে গেঁথে রাখলাম। দোকানী মিষ্টি হেসে আমার সব জিনিষ জোগাড় করে দিলেন। এমনকি কয়েকটি কাঁচা আমও। নারগিস আমের কথা বলে দিয়েছিল। আমি আর অন্য কোন দোকানে গেলাম না। দোকানী নিজে অন্য দোকান থেকে এনে দিলেন। পায়ের নিচে পিচ্ছিল কাদা। সাবধানে মধুবাগের রাস্তায় পা বাড়াব তো দমকা বৃষ্টিতে গা মাথা সব ভিজে গেল। বৃষ্টির মধ্যেই সাবধানে রাস্তাটা পার হয়ে ভেজা অবস্থায়ই একটি স্যানিটারী দোকানে ঢুকে আশ্রয় নিলাম।

ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলাম। পাছে আর মনে রাখতে না পারি, আজ সকালেই তাই ঘটনাটির কথা একটু তুলে রাখছি।...

২৬.০৫.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, মানুষ, মানুষের জন্য

এখন সকাল ১০টা। ১২টার সময়ে যেতে হবে মগবাজার। আমার অবুঝ ছেলের বাসায়। আজকাল একা যাতায়াতে ভয় করে। পথে কিছু হলে তার খবরটাও পৌঁছে দিতে পারবো না।

এই সকালে আমার হিসাবের খাতায় কিছু লেখা উচিত নয়। অন্য সময়ে আমি লিখিও নে। দিনের হিসাব দিনান্তেই টুকে রাখি কিন্তু আজ যে দুটি পত্রিকা এসেছে, তার সংবাদের শিরোনামগুলো দেখে 'জনকণ্ঠে'র চতুরঙ্গ পাতাটিতে চোখ বুলালাম। দেখলাম, পরিচিত জনদের লেখা আছে। প্রীতিভাজন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'সহিষ্ণু সময়'-এর একটি কিস্তি আছে। পড়তে হবে। মনে হল, পাঠ প্রসঙ্গ, পাঠাগার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেছেন।

পাশের চতুরঙ্গ পৃষ্ঠার নিচের অংশটি জুড়ে একটি কাহিনী বেরিয়েছে। ভাবছিলা, পরে পড়ব। কিন্তু প্রথম দু'লিম ছত্র পড়ে, পুরোটা না পড়ে আর রুখতে পারলাম না। লেখাটি তথা কাহিনীটির শিরোনাম 'মানুষ, মানুষের জন্য'। এর নাম এমনও হতে পারত : একটি সত্য কাহিনী। লেখক এম তাজুল ইসলাম।

কে এই তাজুল ইসলাম? ইনি কি জা.বি.র অর্থনীতির অধ্যাপক সেই হাসিমুখ তাজুল ইসলাম, আকাশের বন্ধু যিনি ইরাকের উপর আকাশের দেওয়া সেমিনারে সেদিনও অংশ নিয়েছেন? তাঁর সঙ্গে যখনি দেখা হবে, তখনি বলব : এ কাহিনী আপনি লিখেছেন? তাজুল নিশ্চয়ই বলবেন : আমি লিখিনি, আমি বর্ণনা করেছি। ঘটনাটা ঘটেছে। আমি বলব : আপনার এ লেখা আমি পাঁচবার পড়েছি, আমি একশ' বার পড়ব। পড়তে পড়তে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

হ্যাঁ, আমিও বলব, মানুষ, মানুষের জন্য। এখনো, এই বিপর্যয় কবলিত পৃথিবীতে, সর্বত্র, সর্বদেশে। আমি ধন্যবাদ জানাব জনকণ্ঠের আমার প্রিয় এখলাসকে এই কাহিনীটি প্রকাশ করার জন্য। আমি স্নেহভাজন, 'শর্টফিল্ম' মেকার তানভির মোকাম্মেলকে পেলে বলব : নাও, এই তোমার আর একটি শর্টফিল্মের চিত্রনাট্য। একটুও অদলবদল করতে হবে না। তুমি শুধু চিত্রায়িত কর। যথাসাধ্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এ ঘটনার বর্ণনাকারী তাজুল ইসলামের যেমন, এ একটি চিরায়ত কাহিনী তেমনি তোমার হাতেও এ একটি চিরায়ত চিত্র হিসাবে চিরজীবী হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, মানুষ মানুষের জন্য। আমি সেলিনাকেও বলব : নাও, এটি তোমার আর একটি উপন্যাসের বিষয় হোক : 'মানুষ, মানুষের জন্য'।

সকালে লেখা এ বাক্য কয়টি এখন রাত সোয়া ন'টায় আবার পড়লাম : আমার মগবাজার থেকে ফিরে এসে। এখনো ভাল লাগছে। 'জনকণ্ঠ'কে কথাটা জানাতে হবে।

মনটিতে এখন আছে। তারাশঙ্করের 'কবিয়াল' গীতিনাট্যের নায়ক, তরুণ কবিয়াল নিতাইচরণের উচ্চারিত লাইনটি আমি ভুলতে পারিনে। মনে পড়লেই আমার মন ভিজে ওঠে : 'গুণীজন, আমি অতি সাধারণ, পথের ধুলায় মানুষ, তবু এই খেদ আমার রয়ে গেল : 'জীবন এত ছোটো ক্যানে?' আহা, কি তাৎপর্যময় কথা।

মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকে, সেও এক রহস্য। নিতাইচরণকে আমি কোনদিন দেখিনি। অথচ তার খেদ আমারও খেদ। জীবনটা এত ছোট ক্যানে?... গতকালই লিখেছিলাম, আজ আমার অবুঝ ছেলের বাসায়, মগবাজারে যেতে হবে : ছেলে জ্যোতির সঙ্গে দেখা হবে। ওর মিউ, আমার স্নেহের নারগিসের সঙ্গে দেখা হবে এবং রবির সঙ্গে। আমি কড়া নাড়তেই রবি ওপার থেকে বলবে, দাদু! একটু দাঁড়াও। তার পরে নারগিস জ্যোতির কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসে গেটের দরজাটা খুলবে। তার সাথে সাথে রবির বিড়ালের বাচ্চাটা, খরগোশের বাচ্চার মত, মিউ মিউ করতে করতে দরজার গেটে আসবে। নারগিসের হাতে আমি আমার মালামালা ভরা ব্যাগটি তুলে দেব।...

মোটকথা মগবাজারের পরীক্ষা আমি পাশ করেছি। এক শ'র মধ্যে ১১০ পেয়েছি! নারগিসটা এক সময়ে বলল : আম্মা কেমন আছেন? আমি তার শরীরের অবস্থার কথা বললাম : ভাল না।

নারগিস বলল : আম্মাকে আপনি পেয়েছিলেন বলেই আপনার জীবন এমন সুন্দর!

আমি বললাম : আর তোমাকে পাইনি? ও সুন্দর করে হাসল।

রবির বয়স বোধহয় এখন ছয় পেরুচ্ছে। রবি তার আঁকা ছবি দেখাল। বাংলা ডিজনীর কুসুম কুমারীর গল্প পড়ে পড়ে শোনাল। নিজের হাতের লেখা দেখাল। আমি চমকে উঠলাম। ওর হাতের লেখা আমার চাইতে অনেক ভাল। নারগিসের লেখা আরও ভাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবি আমার সঙ্গে খেলল। আমার পাশে ঘুমাল। আমি ওর গায়ে হাত রেখে ওর পাশে শুলাম। এক সঙ্গে খেলাম। ও পাল্লা দিয়ে আমাকে হারিয়ে দিল। জ্যোতি, নারগিস, রবি : যেন তিনজনই তিনজনের রাত্রিদিনের সঙ্গী। বিকেলে নারগিসের দেওয়া লিস্টি ধরে বাজার করলাম। একটি পরিচিত দোকানের তরুণ ইয়াকুবের কাছে জিনিসের তালিকা দিলাম। একটু কাঁচাবাজারের জন্য মধুবাগেও গেলাম। জ্যোতির চাহিদামতো প্লাস্টিকের একটি বালতি কিনলাম। সেটি বাসায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে সে বলল : এটা নয়। আর একটু বড় লাগবে। আমি রাগ না করে বললাম : ঠিক আছে আমি বদল করে আনছি।...

সবই ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়েছে। আশঙ্কার অতীত তো বটেই, আশারও অতীত।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছুটি পেলাম। জ্যোতি কাঁঠাল কিনেছে। নারগিস একটি আইসক্রিমের বাটিতে তার বেশ কিছু কোষ আমাদের বাসার জন্য দিল, কলির জন্য দিল। রবি বলল : দিদাকে খেতে বলবা। না খেলে আমি কিন্তু রাগ করব।

আমি বললাম : না, তোমার দিদাও খাবে, আমিও খাব। একটি বেবি পেয়ে গেলাম। নিরাপদেই রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরলাম। কলি দরজা খুলে বলল : আজ এত সকালে ফিরতে পারলে!

হ্যাঁ, এবং মনের আনন্দে ফিরেছি। কোন সমস্যা হয়নি। জ্যোতি খুবই সুন্দর মেজাজে কথা বলেছে। বলেছে : তোমার কষ্ট হলে, তুমি আসবা না। আমি তোমার বাসায় যাব।

আমি বলেছি : ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদের যে দেখতে ইচ্ছা করে।

কলি বলল : দেখবা, জ্যোতি অনেক ভাল হয়ে যাবে।

আমি বললাম : ভাল ত হচ্ছে।

আগামীকাল সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রীতিভাজন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে সেন্ট্রাল উইমেন্স-এর ব্যাপার নিয়ে একটু দেখা করতে যাব। তিনি সময় দিয়েছেন। এটিও একটি ভাল খবর।...

১১.০৫.২০০৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়াই হাজার বছর বয়সী এক বৃদ্ধের উক্তি

না, এখন রাত বারটা নয়। এখন সকাল ১০টা। তারিখ ক্যালেন্ডার বলে, ২৬ জুন, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। এসব হিসাবে আমার কি লাভ? কেন ক্ষতিই বা কি? কোন্ দিক দিয়ে দেখব : সেটাই আসল কথা। পেছন থেকে, না সামনে থেকে? ক্লাসের লাস্টবয়ও ফার্স্টবয় হয়। শুধু দৃষ্টির আবশ্যক। নিচ থেকে দেখলে সে অবশ্যই ফার্স্ট। উপর থেকে দেখলে আলাদা। অবশ্য নিচ কাকে বলে, আর উপর কাকে বলে, তারও মীমাংসা আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি।

এমন এলোমেলো বাক্যের উদ্বোধন এই সকালে, এই কারণে যে, সামনের অপেক্ষমাণ অন্ধকার রাতের বারটা আমার জন্য কি নিয়ে অপেক্ষা করছে, তা আমি জানিনে। সে জন্য দিনের শুরু তো করলাম, শেষ যাই হোক।

আমার এলোপাতাড়ি বই-এর স্তূপে হাত লাগাতে, হাত পড়বি তো পড়, একেবারে প্রায় আড়াই হাজার বছরের বয়সী এক বৃদ্ধ এ্যারিস্টটল-এর গায়েই পড়ল। এর উচ্চারণ যে যাই-ই করুক, আরম্ভ, না আরিস্টটল তা আমি জানিনে। আমি ইংরেজীর উচ্চারণ মেনে করেছি 'এ্যারিস্টটল'। এ্যারিস্টটল সঠিক বলে নয়। আমার আড়ষ্ট জিহ্বায় যেমন আসে।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এ্যারিস্টটলের জন্য আমার মায়া হয়। আড়াই হাজার বছর বয়সী বৃদ্ধ এ্যারিস্টটল। অবশ্য তিনি আমাকে আজও মুগ্ধ করেন। সে এই কারণে নয় যে, তিনি প্লেটোর দুরন্ত এক শিষ্য। (৪২২৭-৩৪৪৭ খ্রিঃ পূঃ) প্লেটোর একাডেমীর। কাহিনীকাররা বলেন। আলেকজান্ডারের একটা দুরন্ত অশ্ব ছিল। তার নাম বুনেফালাস। এবং এ্যারিস্টটলের দুরন্ত একটি অশ্ব ছিল। তার নাম আলেকজান্ডার। কে কাকে কতখানি বশ করেছিল, সে যেমন উপাখ্যানের বিষয়, তেমনি ইতিহাসের।

সে কথা থাক। আজ যখন দেখলাম আমার এ্যারিস্টটল-এর 'পলিটিকস্' একেবারে ধুলাচ্ছন্ন হয়ে গেছে! আহা বেচারীর কি দুর্দশা। প্রায় আড়াই হাজার বছর পরবর্তী বাংলাদেশে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাকে ধুলো মুছে একটু আদর করতে চাইলাম। কারণ এর পেছনে জেলখাটা আমার তো কম শ্রম আর ভালবাসা ব্যয় করতে হয়নি। সে কথা বাংলাদেশের কোন পাঠক আর ছাত্র-ছাত্রী কাউকে শোনাতে পারিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে যখন গলা ফাটিয়ে বলেছি : এই এ্যারিস্টটল-এর আর এক নাম, প্রাচীনকালের অন্যতম বিশ্বকোষ : 'এ্যানশিয়েন্ট এনসাইক্লোপিডিয়া', তখন শেষ বেঞ্চের দিকে চোখ পড়াতে দেখেছি দুটি তরুণ-তরুণী তাদের প্রেমের খুনসুটিতে ব্যস্ত। আমি তাদের কিছু বলিনি। আমি চালিয়ে গিয়েছি : এ্যারিস্টটলের জন্ম প্রাচীন মেসিডোনিয়ার স্টাগিরায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪তে। আর মৃত্যু এথেন্সের বাইরে একটি দ্বীপে ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তো আমার ক্লাসে নেই। অন্ততঃ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে। আমার নিজের জীবনের প্রায় অন্তিম ক্লাসে। তাই এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর জন্য আমার মায়ার আধিক্য। হায়রে 'বাঙালগণ', তোমরা বুঝলে না, কি মণি তোমরা 'ফুটপাত' দিয়ে চলতে পায়ে মাড়াচ্ছ, কিন্তু মাথায় তুলে নিচ্ছ না!

এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর গায়ের ধুলো আমার গায়ের জামা দিয়েই মুছলাম। পরিষ্কার করলাম। প্রচ্ছদ উল্টে একটি অর্থহীন উৎসর্গ বাক্য পাঠ করলাম : একালের এবং আগামীকালের জ্ঞানার্থীদের উদ্দেশে।

আসলে বাক্যটি অর্থহীন নয়। উদ্দিষ্টগণ অর্থহীন আর বর্বর হতে পারে। তা আর কি কা। কোন জীবনই তো যন্ত্রণাহীন হতে পারে না। এবং জীবনের বড় যন্ত্রণা বোধহয় পরিবেশের বর্বরতা। বা বর্বর পরিবেশের অসহায় শিকারে পরিণত হওয়ার যন্ত্রণা।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে চারদিকের সকল বর্বরতা উপেক্ষা করে আমার এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর ভেতরে চোখ বন্ধ করেই পাতা উল্টালাম। দেখি, কি বার হয়। আমি এর এক অন্ধভক্ত। আমি জানি এর যে কোন পাতাটিই স্বর্ণ কেন, হীরক খণ্ড। অপরে না বুঝুক, যে-বুঝবার সে বুঝুক। এবং চোখ খুলতেই দেখলাম : এ এক মহামাণিক্য। অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য এক সত্যের উচ্চারণ। দেশ কাল নির্বিশেষে এক অনিবার্য এবং অপরিহার্য : রাষ্ট্র এবং সমাজ-সত্য। 'শাসকদের তিনটি গুণের আবশ্যকতা : পঞ্চম পুস্তকের নবম অধ্যায়'

সরকারী ক্ষমতা যারা ধারণ করে তাদের তিনটি গুণ অত্যাবশ্যক : ১. প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। ২. সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের যোগ্যতা। এবং ৩. প্রচলিত সমাজের উত্তমতা এবং সততা (ন্যায়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। কারণ, নীতির মান সকল শাসন ব্যবস্থার এক নয়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে : এই সকল গুণের সাক্ষাৎ একই ব্যক্তির মধ্যে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে শাসক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কি প্রকারে?

কারুর যদি সামরিক দক্ষতা থাকে, কিন্তু মানুষের হিসাবে তার মান উচ্চ নয়, শাসন ব্যবস্থার প্রতিও তার মনোভাব অনুকূল নয়, এবং অপর একজন এমন যে সৎ এবং অনুগত : এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় কি?

এখানে দুটো জিনিসের প্রতি আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে : কোন্ গুণ সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় এবং কোন্ গুণ সাধারণভাবে তত পাওয়া যায় না। সেনা অধিনায়কতা নির্ভর করে সততার চাইতে অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞতার উপর। কারণ, সত্যতার চাইতে সামরিক দক্ষতা কম লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারী যে-দায়িত্বের করণীয় হচ্ছে লোকের উপর খবরদারি এবং সম্পদের রক্ষা, সেখানে ব্যাপারটা এর বিপরীত। এখানে সাধারণের চাইতে অধিক পরিমণে আবশ্যক সত্যতার, কিন্তু যে-গুণ সকলের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, তেমন গুণের নয়।

আর একটা প্রশ্নও উঠতে পারে : আন্তরিকতা এবং দক্ষতা দুটো যদি পাওয়া যায়, তাহলে ন্যায়ের আর প্রয়োজন কি? এ দুটো গুণ থাকলে বাকি যা প্রয়োজন, তাও কি সৃষ্টি হবে না? এর জবাবে আমরা বলতে পারি, কোন মানুষের এই দুটো গুণ থাকা সত্ত্বেও নৈতিকভাবে সে অযোগ্য হতে পারে। এবং এমন মানুষ যদি, যা সর্বোত্তম এবং ঠিক, তা সম্পাদনে সক্ষম হয়, যদি সে নিজের, তথা যাকে সে জানে এবং ভালোবাসে, তার মঙ্গল সাধনে অসমর্থ হয়, তাহলে দেশের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রেও সে কি অক্ষম হবে না?

মোটকথা, যাকে আমরা একটি নগরীর শাসন ব্যবস্থার জন্য উত্তম আইনসমূহের নীতি বলে বিবেচনা করি, প্রতিটি ক্ষেত্রে তা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ বিশেষ এবং এরই অন্তর্গত হচ্ছে প্রায়শ ব্যক্ত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি। অর্থাৎ এ অবস্থার নিশ্চয়তা যে, শাসন ব্যবস্থাটিকে যারা বজায় রাখতে চায়; তাদের সংখ্যা, যারা তা বজায় রাখতে চায় না, তাদের চাইতে অধিক হতে হবে। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির উচ্চারিত এই বাক্য কয়টিকে আমাকে আবার পড়তে হবে, এবং বারংবার পড়তে হবে।...

২৬.০৬.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ সরল সত্য কথা

একত্রিশ আগস্ট : মঙ্গলবার। এখন সকাল ১০টা। আমার খাতার পাতায় এই সকালে আমি কি লিখব? আর কিছু না লিখেই বা কি করব? এক মিনিট আগের কথা এক মিনিট পরে আর মনে করতে পারিনে। আসলে আমি ছোট মানুষ এবং মাথাটিও ছোট। এর ভেতরকার স্মৃতি-বিস্মৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সারকিটের সূত্রগুলির ক্ষমতা কম। বড় বড় লেখকদের মত নয়। আমার সদ্যপ্রয়াত বন্ধুবর সন্তোষ গুপ্তের স্মরণশক্তিকে আমি আগেও যেমন, এখনো তেমনি ঈর্ষার মন নিয়ে স্মরণ করি।

এখন খবরের কাগজের বড় হরফে মুদ্রিত শিরোনামগুলিই মাত্র পড়তে পারি। বাসায় আজ তিনটি কাগজই এসেছে : 'জনকণ্ঠ', 'ভোরের কাগজ' এবং 'প্রথম আলো'।

সকল এবং প্রত্যেকেরই শিরোনাম এক এবং তার হরফের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা এবং প্রস্থও এক। আমার জিজ্ঞাসা তাঁরা কি তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকার হরফের রং ও আকার দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কি হবে তা নিয়ে মোবাইলে জিজ্ঞাসারাদ করে স্থির করেন? তেমন হলে তো আরো ভালো হয়।

আমার তো মনে হয় আমাদের দেশের অসহায় মানুষের মনের যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের সব পত্রিকা তথা দৈনিকের উচিত এক শিরোনাম, তথা অভিন্ন শিরোনাম দেওয়া। কেবল শিরোনাম নয় : একই সম্পাদকীয়, অভিন্ন বক্তব্য। তাই অভিন্ন সম্পাদকীয়।

এমন ঘটনা আমার কল্পনা নয়। আমার জীবনে সমাজ ও মানুষের সংকটকালে সৎ এবং বিবেকবান মুখপত্র : সবাই অভিন্ন আওয়াজ তুলেছেন। অভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। আমি তো বুঝি বিভিন্ন পত্রিকাতেই একই আওয়াজ তোলার চাইতে, বিভিন্ন পত্রিকাতে একই রকম আওয়াজ তো বটেই : থাকুক না একই রং, একই ভাষা এবং বক্তব্য : অর্থাৎ সব কিছুতে অভিন্ন যেন সংকটকালে কোন বিভিন্নতার বদলে অভিন্নতার প্রয়োজনই যে অধিক। বিভিন্নের চাইতে অভিন্ন অধিক শক্তিশালী।

না, আমি হাল্কা টোনে বলছিনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনকণ্ঠের কপি আজ এসেছে, তাতে আমি খুশি হয়েছি। দু'এক সময়ে আসে না। সৌজন্য কপি হিসাবে আসে। তাই রীতিমত এলে আমি অধিকতর আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা বোধ করি।

কিন্তু যার জন্য আজকের জনকণ্ঠের কথা তুলেছি সে হচ্ছে তার তথা ৩১শে আগস্টের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার ডান পাশের শিরোনামের স্মৃতিচারণটি : '২১ আগস্টের গণহত্যা যেভাবে ঘটেছিল'।

বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেছেন মেজর জেনারেল (অব) তারিক সিদ্দিক। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। জনকণ্ঠের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে ২১ আগস্টের ঘটনার সাক্ষাত বিবরণটি এতে প্রকাশিত হয়েছে। জনকণ্ঠের এই সংখ্যাটি এই বিবরণটি আমাকে রক্ষা করতে হবে। ইচ্ছা হচ্ছিল দিনলিপির মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলক বিবরণটি পুরো তুলে রাখি। কিন্তু তা তো আমার শক্তিতে কুলাবে না। আমার এ দিনলিপির বরাতে যদি কোন পাঠক মেজর জেনারেল (অব) তারিক সিদ্দিকের এই স্মৃতিচারণটির উল্লেখ দেখেন, তাহলে তিনি যেন আগে পাঠ না করলে আজকের তারিখের জনকণ্ঠে : ৩১ আগস্টের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে তাঁর প্রদত্ত বিবরণটি পাঠ করেন।

তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে গণতদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাঁরা তাঁদের দলিলপত্রে বর্তমান বিবরণটিও যেন অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমার এই বয়সে, ভাগ্যে বা ভবিতব্যে বিশ্বাস করা উচিত না হলেও নিজের কাছে নিজে যেন না বলে পারছিনে : আমাদের জাতীয় জীবনে আগস্ট মাসটা যেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে অপয়া একটা মাসে পরিণত হচ্ছে।

এই আগস্ট মাসের পনের তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ওরা হত্যা করেছে। অন্যান্য বছরের আগস্টের কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু ২০০৪ সালের আগস্ট মাসকে কেমন করে আমরা বিস্মৃত হব। এই আগস্টের ২১ তারিখের এই নৃশংস এবং মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে কেমন করে বিস্মৃত হব। এমন হত্যাকাণ্ড বিনা পরিকল্পনায় কখনো, কোথাও, কোন যুগে সংঘটিত হয়নি। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের কথাও মনে না এসে পারে না। তাছাড়া আগস্ট মাসে হোক বা না হোক আজ থেকে ৭০-৭১ বছর পূর্বে (১৯৩৩-২০০৪) জার্মানীর উদীয়মান ফ্যাসিস্টদের হাতে সংঘটিত হয়েছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাতে তখনকার জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে জার্মানীর পার্লামেন্ট ভবন, যে-ভবনের নাম ইতিহাসে 'রাইখস্ট্যাগ' ভবন নামে আজো পরিচিত, সেই রাইখস্ট্যাগ ভবনে অগ্নিকাণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সুদূরপ্রসারী ব্লুপ্রিন্টের প্রকাশ হিসাবে ঘটেছিল রাইখস্ট্যাগের সেই অগ্নিকাণ্ড। এই ঘটনারও কোন তদন্ত হয়নি। কারণও ছিল জার্মান ফ্যাসিস্টদেরই প্রকাশ। ফ্যাসিস্টরা এই ঘটনার দায়িত্ব চাপিয়েছিল ফ্যাসিজম আর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির উপর।

'Oxford World History' শিরোনামের আধুনিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে সংক্ষেপে হলেও বলা হয়েছে : ... On the night of 27 February, 1933 the REICHSTAG FIRE occured, Goering and Goebbels allegedly planned to set fire to the building, subsequently claiming it was a communist plot..."

একটু অপেক্ষা করুন, একই কায়দায় তদন্তের নামে আর এক ব্লুপ্রিন্টের প্রকাশ ঘটবে এবং এ জন্য দায়ী করা হবে গণতন্ত্রের জন্য এবং সকল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তার সহযাত্রীদের। সেই জন্য এমন গণহত্যার পরিকল্পনা ও ব্লুপ্রিন্ট, অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী মারণাস্ত্র গ্রেনেড সংগ্রহ, সেই সব গ্রেনেডকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাছাই করা ভবন ও স্থান থেকে নিয়ে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিশ্লেষণ ও বক্তব্য রাখার জন্য সমবেত হাজার নেতা, নেত্রী, রাজনৈতিক কর্মী, নাবালক, সাবালক এবং মূল লক্ষ্য শেখ হাসিনাকে টার্গেট করে মুহুর্মুহু গ্রেনেডগুলিকে নিক্ষেপ করা এবং তার পরিণতিতে কেবল যে বিশ জনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে তাই নয়। নিহতদের মধ্যে যেমন রয়েছেন প্রাজ্ঞ নেত্রী আইভি রহমান, তেমনি আরো সব নিবেদিতপ্রাণ নেতা ও কর্মী।

আমার আজকের এই দিনলিপিকেও আমি লেখা বলিনে। বলি, 'যে লেখা লেখা নয়'। হ্যাঁ, লেখা নয়, জীবন। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বলি ১৩ কোটি মানুষ। আমি বলি ১৩ কোটি বই। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব সরল। ওরা কম্পুটার বুঝে কিন্তু বই কাকে বলে বুঝে না। ভাইভা ভোসি বা মৌখিক পরীক্ষার সময়ে যদি জিজ্ঞেস করি, বল বই কাকে বলে, তখন ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকায়, কোন কথা তৈরি করতে পারে না। ওদের সঙ্গে এই সময়ে আমার সংলাপটি বেশ কৌতুকময় হয়ে ওঠে।

: ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? পরীক্ষা দিয়েছ, বই পড়নি?

: স্যার, বই, বই!

: তবে পরীক্ষা দিলে কি করে?

এবার আসল জবাব বেরোয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: স্যার কিছু নোট পেয়েছিলাম।

: কাদের নোট?

: সিনিয়র ভাইদের নোট।

তাতেও আমি অখুশি হইনে। এবার আমি সিরিয়াস হই। ওরা বুঝুক বা না বুঝুক। আর এ কথা শুধু ওদের জন্য নয়। এ আমার নিজের জন্যও বটে। যে কারণে আমি নিজেকে আর বই-এর পাঠক বলিনে। আমি বলি, বই-এর বলদ : গাধা যেমন চিনির বলদ।

আমার চোখ নষ্ট বলে আমি পড়তে পারিনে। আর যথার্থই চার কোনার একটি বস্তু তো বই নয়। বই বস্তু বটে। কিন্তু বস্তু মাত্রই তো বই নয়।

: স্যার, আর একটু সহজ করে বলুন।

: এমন সহজ কথাকে আরো সহজ করা যায় কেমন করে? আসলে তোমরাই তো সহজকে কঠিন করে তুলছ।

তবু বলি, শোন : বই অবশ্যই লিখিত এবং মুদ্রিত, মানুষের এক মহৎ আবিষ্কার। কিন্তু তথাপি যে দেশে, যে বই পঠিত করা হয় না, অক্ষম আমার বাসার মত কেবল স্তূপ করে রাখা হয়, তা বস্তু বটে তবে বই নয়। তাই বলছিলাম, যে বই পাঠ করা হয় না, সে বই, বই নয়। একটা হাল্কা, ভারী বস্তু বটে। কেবল তাই নয়, যে বই পঠিত হয়, কিন্তু তার বিষয়বস্তু আলোচিত হয় না, তার বক্তব্য অনুসৃত হয় না, সে বইও বই নয়। বস্তু মাত্র।

কিন্তু আমার এ ধরনের কথার স্থান এটি নয়। তবু যা না বলে পারিনে, তা না বলে থাকি কি করে?

মার্কিনীরা ইরাকে বাগদাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার এবং জাদুঘর জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। কারণ ওরা পশুরও অধম। কোন পশু আর যাই-ই চিবাক না কেন, যেমন কলার ছোবলা, কলা গাছের বাকল, কিন্তু ওরা বই চিবায় না। কারণ বই চিবালে কোন রস বেরোয় না।

আমরাও তাই। আমরা বই চিবাই। আর যেহেতু তা থেকে রস বার করতে পারিনে, তাই ফ্র্যাংকেনস্টাইন বুশের মত, নিষ্পাপ সম্ভাবনাময়, সভ্যতার সন্তান মানবকুলকে, তার অসহায় শিশু, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ কাউকে হত্যা করতে দ্বিধা করিনে। আর আমরা যে যথার্থই কলিন পাওয়েল আর বুশের বশ্য : তার শেষ হতে এখনো বাকি থাকলেও, খুব বেশি বাকি নাই। তা ফ্রাংকেনস্টাইন বুশও বুঝতে শুরু করেছে। আমার শেষ কথা আমাদের কম্পুটার আর আইটি তথা ইনফরমেশন টেকনোলজির বাহাদুরদের কাছে : রবোট বানান, ক্ষতি নেই। কিন্তু আগে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন, মানুষ বানান। মানুষ রবোটকে বানায়, ভাল কথা। কিন্তু মানুষের বানানো যে রবোট মানুষকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে, তেমন আত্মহত্যামূলক রবোট বানিয়ে বাহাদুরির কাল যে খুব লম্বা হবে, তাও আমি মনে করিনে।

আমার এমন সহজ, সরল এবং সত্য কথায় বাংলাদেশের কোন হাঁড়ি-পাতিলেরই চিড়া ভিজবে না, তা সত্য। তবু এ সত্য কথা বাদেও কারুর হাঁড়ি-পাতিলের পানি যে গরম হবে না, আসলে রাঁচার মত বিশুদ্ধ পানিটুকুও থাকবে না, তাও সত্য।...

৩১.০৮.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য কথার একটি কথামালা

তবুও যখন গতকাল এখলাসকে কোন লেখা দিতে না পারার অসহায়তা নিয়ে বলছিলাম : কিছু তো আনতে পারিনি। তুমি বল আমি কি করব?

এখলাস পাল্টা প্রশ্ন করল : আদর্শের রাজনীতি কি এমনি করে মরে যাবে?

আমি বিমূঢ় মনে কোন জবাব দিতে পারলাম না।

: সরদার ভাই, আপনি লিখুন। আমাদের মহৎ অতীতের কথা লিখুন।

: আমি যে কিছু স্মরণ করতে পারিনে।

: যা আপনার স্মৃতিতে আসে তাই লিখুন। আমরা তো নিঃস্ব নই। আপনি তো নিঃস্ব নন।

আমার চোখ ভারী হয়ে আসছিল। আমি ওর সুমুখ থেকে উঠে এলাম।

একথা সত্য আমি স্মৃতিতে দুর্বল। স্মরণ রাখতে পারিনে। তাই আজ কেবল ভাবছি : যে-সত্য যখন যতটুকু স্মরণে পড়বে সে-সত্যকে তখনি আমি লিখে রাখব : হোক তা একটি শব্দ, একটি নাম, কিংবা একটি ঘটনার উল্লেখ। তা নিয়ে যে-সত্যমালা আমার তৈরি হবে, সেই সত্যমালাকে আমার অবশিষ্ট কটা দিনের জপমালা করে রাখার চেষ্টা করব। এবং আমার সেই বিশ্বাসটুকুকে : সত্যের মৃত্যু নেই।

- সত্যের মৃত্যু নেই।
- নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।
- জীবন মরে না, মৃত্যুই মরে।
- 'তাজমহলের পাথর দেখেছো দেখিয়াছ তার প্রাণ?
- অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।'
- ' যত মত, তত পথ' : রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।
- বুদ্ধং শরং, গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- লিবার্টিং, ইকোয়ালিটি ফ্রাটারনিটি : স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী : ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা।
- আত্মশাসনই সব চাইতে কঠিন শাসন।
- আত্মসমালোচনাতেই আত্মশিক্ষা।
- নো দাই সেফল : নিজেকে জানো : সক্রেটিস।
- সক্রেটিসকে শিষ্যরা বলল : তুমি কারাগার থেকে পালাও।
- সক্রেটিস বললেন : আমি যুক্তি আর নিয়মের বন্দী। আমি পালাতে পারিনে।
- প্লেটো বললেন : আইডিয়াল ইজ মোর রিয়াল, দ্যান দি রিয়াল :: আদর্শ বাস্তবের চাইতে অধিক বাস্তব। (রিপাবলিক)
- এ্যারিস্টটল বললেন : ব্যক্তির শাসনের চাইতে আইনের শাসন হচ্ছে মহত্তর (এ্যারিস্টটল : পলিটিকস্)
- এ্যারিস্টটল বললেন : আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সমবায়ে সংগঠিত একটি সংস্থা, যার অর্জন করার মতো একটি লক্ষ্য আছে, যে-লক্ষ্যকে মানুষ উত্তম বলে গণ্য করে। (এ্যারিস্টটল : পলিটিকস্)
- কোনো মানুষের যদি সাধন করার মতো মহৎ কার্য কিছু থাকে, তাহলে তার সম্মুখে প্রশ্ন, জীবন কিংবা মৃত্যু নয়। তার বিবেচনার একমাত্র বিষয় হওয়া আবশ্যক : আপন কার্য সাধনে সে কোথাও অন্যায় কিংবা অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করল কিনা। (সক্রেটিস)
- যার কাজ তাকে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।
- উত্তমরা শাসক না হওয়ার প্রতিযোগিতা করে। (প্লেটো)
- শাসকের হতে হবে চিকৎসকের মতো নিঃস্বার্থ। (প্লেটো)
- জ্ঞানী এবং উত্তম : লাভের আশা পোষণ করে না। (প্লেটো)
- আধিক্য মাত্র অন্যায়। (প্লেটো)
- সঙ্কটের কারণ : সম্পদ এবং দারিদ্র্য। (প্লেটো)
- শাসকের কোন ব্যক্তিগত সম্পদ থাকবে না। (প্লেটো)
- সর্বাধিক জ্ঞানীরাই হবে শাসক। (প্লেটো)
- জ্ঞান, সাহস, সংযম ও ন্যায় : রাষ্ট্রে কার অবদান কি? (প্লেটো : রিপাবলিক)
- মেয়ে এবং পুরুষের সমতা। (প্লেটো)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- শাসক হওয়ার গুণ মেয়ে এবং পুরুষ, উভয়েরই আছে (প্লেটো)
- একটি রাষ্ট্রের পুরুষ এবং মেয়েরা যতদূর সম্ভব উত্তম হবে।
- সন্তান প্রজনন যদৃচ্ছার ব্যাপার নয়। (প্লেটো)
- যেমন দেহ, তেমন রাষ্ট্র : একটি সামগ্রিক সত্তা। (প্লেটো)
- ন্যায়ের অন্বেষণেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।
- দার্শনিককে 'রাজা' তথা শাসক হতে হবে। (প্লেটো)
- আমি জানি, আমি জানিনে, ওরা জানে, ওরা জানে না। (সক্রেটিস)
- সুখ এবং দুঃখ : পরস্পর সম্পৃক্ত। (সক্রেটিস)
- দ্বান্দ্বিকতা জ্ঞানের শীর্ষ প্রস্তর। (প্লেটো : রিপাবলিক)
- গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রী চরিত্র। (প্লেটোর রিপাবলিক : অধ্যায় ২২)
- গণতন্ত্রে অরাধ স্বাধীনতা (প্লেটো)
- গণতন্ত্রে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী আত্মা। (প্লেটো)
- স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের চরিত্র। (অধ্যায় ২৩ : প্লেটো : রিপাবলিক)
- স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের পরিণাম (৯ম পুস্তক : রিপাবলিক)
- স্বৈরতন্ত্রের বন্দী আত্মা। (৯ঃ ৫৭৯ : রিপাবলিক)
- ... কিন্তু এক ব্যক্তি একই সঙ্গে ধনবান এবং দরিদ্র হতে পারে না এবং এ কারণেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে : সম্পদবান এবং সম্পদহীন, এই দুই-এর মধ্যে। (পলিটিকস্ : ৪ ঃ ৪)
- আমাদের বরঞ্চ এ কথাই বলা সঙ্গত যে, দরিদ্রগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র। (পলিটিকস্ : ৪ ঃ ৪)
- আইন যেখানে শাসন করে না, সেখানে কোন শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। (পলিটিকস্ : ৪ ঃ ৪)
- মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সে সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ (রুশো : সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট : ১ম অধ্যায়, ১ম বাক্য)
- জোর এবং জোরের পরিফলই যদি আমার রিবেচ্য হত, তাহলে আমি বলতাম, যতক্ষণ মানুষ জোরকে মানতে বাধ্য হয় এবং মানে, ততক্ষণ সে ভালই করে। এবং যখন সে জোরের জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়, তখন সে পূর্বের চাইতেও উত্তম কর্ম সাধন করে। (রুশো : সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- মানুষ যদি সবাই দেবতা হত, তবেই গণতন্ত্র সম্ভব হত। (রুশো)
- সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বৈরাচার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারের চাইতে কম স্বৈরাচার নয়। (জন স্টুয়ার্ট মিল)
- জোর নয়, সম্মতিই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। (টিএইচ গ্রীন)
- দেশের রক্ষী বাহিনী হবে নাগরিকদের রক্ষক, ভক্ষক নয়।
- আদিকালে সমাজ যে এমন ছিল, তা যেমন কল্পনা করা যায় না, অনন্তকাল এমন থাকবে তাও কল্পনা করা চলে না।
- মানুষের উপর মানুষের শাসন কোন যৌক্তিক ব্যাপার নয় : আমরা কল্পনা করি, এমন একদিন আসবে যে-দিন মানুষের উপর মানুষের শাসনের জায়গাতে বস্তুর উপর মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। (কার্ল মার্কস)

শেষ বাক্যে আমি নিজের কাছে নিজের এই বিশ্বাসটি রাখতে চাই যে : আদিকালকে যেমন আমি জানিনে, অনন্তকালকেও তেমন জানিনে। তবু বস্তুর ক্রমপরিবর্তনই যে কাল, তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

আদর্শ : আদর্শ কথাটি একটি অনির্দিষ্ট শব্দ। আমার আদর্শ ক্রমান্বয়ে মানুষ হওয়ার। তবু অপর একজন যে আদর্শ তার আচরণে প্রকাশ করছে তাকে আমি অ-মানুষিক বললেও সে তা স্বীকার না করতে পারে। সেখানেই দ্বন্দ্ব : যেমন আদর্শে আদর্শে, তেমনি আদর্শবাদী মানুষে মানুষে।

মোট কথা : আদর্শবিহীন কোন মানুষ নেই। মানুষের অভিমত এবং আচরণে মানুষের আদর্শের প্রকাশ।

কোন একটি আদর্শ অপরিবর্তিতভাবে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল বাস্তব থাকবে : বস্তুর পরিবর্তন এবং দ্বান্দ্বিকতায় : এমনও চিন্তা করা চলে না। কালের মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন। এ কোন পাঁচসালা দশসালার ব্যাপার নয়। এ যথার্থই অনন্তকালের ব্যাপার।

আমার এমন ব্যক্তিগত 'বুলিগুলি' শক্ত হলেও, আমার মনের জন্য শক্তিহীন নয়।

বন্ধুবর এখ্‌লাসকে একথাই বলতে হবে। সে এতে খুশি হবে কিনা জানিনে। তবুও, এখলাস যে আমার অস্তিত্বের একটা মূলে হাত দিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

২২.১২.২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৭১-এর আলামত?

একদিন নিজের দিনলিপিতে লিখেছিলাম : আবার যেন '৭১-এর কিছু ভাব আসছে। তাতে নিজের মনে ভয় বাড়ে। কাল হরতাল নাই তো, পরশু হরতাল আর উভয়পক্ষে সংঘর্ষ আর মারপিট। আমি মারপিটের লোক নই। হরতালের গন্ধ পেলে আমি খোঁড়া পায়ে রাস্তায়ও বেরুইনে। একটা ফোন আছে, চালু থাকলে প্রিয়জনদের কাছ থেকে কিছু খবর পাই। নিজের মনের কথাও বলি।

আমার বড় ক্ষতি রাস্তায় বেরুতে না পারলে আমার কাঁচামালের বড় অভাব ঘটে। কিছু যদি নাই-ই দেখি তবে মনের পাতায় লিখবই বা কি? স্মরণই বা কি করব? কাকে করব?

এমন অবস্থাকে আমি নিজেই বললাম, উভয়সংকটের অবস্থা। কেবল ব্যক্তিগত উভয়সংকট নয়। বৃহৎভাবে জাতিগত উভয়সংকটও বটে।

উভয়সংকট কাকে বলে?

প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটি অনুজাকে উদ্দেশ করে কারাগারে বসেই একটি যুক্তিবিদ্যা বা লজিকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল ও যেসব শব্দকে কঠিন মনে করে, যেমন 'ডিডাকটিভ', 'ইনডাকটিভ', 'সিলোজিজম', 'হাইপোথেটিকাল', 'ডিলেমা', 'হরনস্ অফ ডিলেমা : ওর জন্য একটু সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। যুক্তিবিদ্যা নামে পাণ্ডুলিপিটি শেষও করেছিলাম। ১৯৬০-৬২ সালে 'মুক্তধারা'র বন্ধুবর চিত্ত সাহা পাণ্ডুলিপিটিকে মুদ্রণও করেছিলেন। বাংলাতে যুক্তিবিদ্যার কোন বই না থাকাতে বইটির কিছুটা ছাত্রপ্রিয়তাও হয়েছিল।

কিন্তু কয়টা বই-ই বা এখানে ছাপা হয়? এখন বইটি একেবারেই দুর্লভ হয়ে গেছে। সেই জন্য মনে একটু বেদনা বোধ হয়। নতুনভাবে ও কাজে এ বয়সে হাত দিতে পারব না। আর অন্যান্য লেখক যার যার ভঙ্গীতে এর উপর কাজ করেছেন। তবু নিজের কাজ তো! হারিয়ে যাওয়াতে মনে ব্যথা জাগে। মাওলা ব্রাদর্সের মাহমুদ আমার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছে। পাঠ প্রসঙ্গ, গল্পের গল্প, প্লেটোর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রিপাবলিক', 'এ্যারিস্টটলের পলিটিকস্' রুশোর সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট। মাহমুদ বলেছে, 'যুক্তিবিদ্যার' পাণ্ডুলিপিটি পেলে আবার ছেপে দেবে।

কিন্তু ওটি পুনর্মুদ্রিত হলেও আমার এবং আমাদের 'উভয়সংকট' বা 'ডিলেমা'র সমাধান হবে না। হয়ত একটু বুঝা যাবে 'উভয়সংকট' কাকে বলে।

তা ঐ পাণ্ডুলিপি বাদেই নিজের জীবন দিয়ে প্রতিদিন বুঝছি উভয়সংকট কাকে বলে।

যেমন : হরতালের দিন আমরা কি করব? যারা হরতালের ঘোষণা দেন এবং যারা হরতালকে সর্বাত্মক বাধা দানের কথা বলেন তাদেরও উভয়সংকট।

যারা বলেন : এমন জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে হরতাল ছাড়া আমরা কি করব? আবার যারা সর্বাত্মক বাধা দানের কথা বলেন, তারাও বলেন, হরতাল বিনা বাধায় পার পেয়ে যাবে, তা আমরা হতে দেব না। বিনা বাধায় হরতাল হলে, হরতালওয়ালারা বলবে এমন সর্বাত্মক হরতালের পরে এই জুলুমবাজ সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাই। এখনি তাকে বিদায় নিতে হবে।

আবার হরতাল সফল হয়েছে এ কথাও হরতাল বিরোধী তথা সরকার স্বীকার করতে পারে না। তাহলে হরতালপক্ষীয়দের গলার জোর আরো বেড়ে যায়। তাদের লোক সমাবেশের দৃশ্য আরো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুই আওয়াজের লাভালাভের হিসাব আমি জানিনে। তবে হরতাল হলে আমার কাঁচামালের বেশ অভাব পড়ে যায়। এটা সত্য। আমার কাঁচামালের উৎস রাস্তায় মানুষের চলাচল, দেখা সাক্ষাৎ।

: আরে সরদার ভাই, কই চললেন?

: এই তো আপনার রেস্টুরেন্টেই একটু বসতে যাচ্ছিলাম। ওখানে বসলে রাজা উজীরের অনেককেই ধরাশায়ী করা যায়। সেটাকেই আমার মনের দিনলিপি বলি, কিংবা বলি; যে লেখা লেখা নয়।

তাই ভাবছিলাম, আজ বরঞ্চ 'উভয়সংকট' কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। ঘরে বসে এটি করা যায়। ইংরেজীতে হরনস্ অফ ডিলেমা। আমরা বাংলা করেছি 'উভয়সংকট'। ইংরেজীতে একে উত্তরণের একটি কৌশলের কথাও বলা হয়েছে : হরন্ বা হরনস মানে সিং। হরনস্ অফ ডিলেমা বলে, কি করব, কি করব এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন লাভ হয় না। বিপদমুক্ত হওয়া যায় না। তাই ইংরেজীতে বলে 'টেক বাই দি হরনস্'। যে কোন একটা সিংকে আঁকড়ে ধরো। তারপর যা হবার, তা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা করিও তাই। হরতালওয়ালা বলে : কি করব? একটা কিছু তো করতে হবে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ো রাস্তায়। যা হবার হবে। কারিগরি কৌশল ক্যামেরা, চলচ্চিত্র ক্যামেরা ইত্যাদি উদ্ভাবনের একটা লাভ, টেলিভিশনের সামনে বসেই, জীবন বিপন্ন না করেও, আমরা এই ঝাঁপাঝাঁপির দৃশ্য দেখতে পারি। মনে করতে পারি আমরাও শরীক। কথাটা পরিহাস করে বলেছিলেন। যখন দেখি এই হরতালের মাঝে বর্ষীয়ান বন্ধু আবদুস সামাদ আজাদ রাস্তার মাঝখানে যথার্থই বসে পড়েছেন, সুন্দর অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর অভিনয় নয়, যথার্থই বন্দুকধারী পুলিশের বন্দুকের বাঁটের আঘাতে কাত হয়ে পড়ছেন, যখন দেখি ব্যতিক্রমী মতিয়া চৌধুরী কাঁটাতারের বেড়া ভেঙ্গে এগুবার চেষ্টা করছেন এবং পুলিশের লাঠির বাড়িতে রক্তাক্ত হচ্ছেন, তখন ঘরে, বাইরে সকলের মনেই একটা জজবা তৈরি না হয়ে পারে না। এবং পানি গরমের ক্ষেত্রে যা হয়, মানে চায়ের কেটলীর পানি, প্রথমে অল্প গরম, তার পরে আবার একটু গরম, এবং পরিশেষে গরমের পরিমাণের বৃদ্ধিতে পানির, পানি থেকে গ্যাসে রূপান্তর। এই হচ্ছে সামাজিক রসায়নের কথা। পরিমাণ থেকে গুণে পরিবর্তন : কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটিতে রূপান্তর। তবে কেমন করে যে হয়, তা সবটা আমরা জানিনে, কিন্তু এটা ঠিক এমন হয়েছে, এবং হচ্ছে : সেই ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লব বলুন, সেই ফরাসী বিপ্লব, ভারতের চল্লিশের দশকের, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬-এর কথা বলুন সেই সব ঘটনা : ৮০ দিনের ট্রাম ধর্মঘট, নৌবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের কথা বলুন, তাই। আইএন এর বিচার। রশীদ আলী দিবসের উত্থান : বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু, কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটি।...

কিন্তু আর থাক। খোঁড়া পা নিয়ে রাস্তায় বেরুতে পারিনি বলেই ঘরে বসে এই আত্মরতি। এর মূল উদ্দেশ্য আমার মনের কাঁচা মালের শূন্যতার কিছু পূরণের চেষ্টা।

মোটকথা, হাসতে হাসতে বললেও, হাসির কথা হাসিতে শেষ হয় না, টেলিভিশনে ছবি তুললেও, টেলিভিশনের ছবি রক্তহীন থাকে না, যা পরের দিন কাগজ ওল্টালেই আমরা দেখি। তখন ব্যাপারটা রাজা-প্রজা কারুরই খুব হাল্কাভাবে নেওয়ার উপায় থাকে না।

আমার জন্ম একাত্তরে নয়। তার বেশ আগে। কথাটা বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের জীবনে কেবল ইতিহাস পাঠ নয়, ইতিহাসের কিছুটা যে দেখতেও পেয়েছি, সে কথা বলার জন্যও বটে। আসলে আমরা সবাই ইতিহাসের সন্তান; জানি বা না জানি : দর্শক হই বা না হই।

১৮.০২.২০০৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই কাজ, তো খৈ ভাজ

রাত দশটার দিকে 'ন্যাপ মুজাফ্‌ফরের' বন্ধুবর মুজাফফর তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আমাকে ফোনে ডেকে প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমার 'প্লেটোর সংলাপ'-এর প্রশংসা করে নানা কথা বলেছে। আলাপটি আমার ভালো লেগেছে। মুজাফফর নিজে 'প্লেটোর সংলাপ' আজিজ সুপার মার্কেট থেকে কিনে বেশ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছে। ওঁর কেবল প্রশ্ন ছিল : সত্যই কি এই রকম একটা মানুষ ছিল?

: ইতিহাস তো তেমনি বলে। আমি তো তেমন বিদ্বান বা গবেষক নই।

: আরে রাখো তোমার বিনয়।

: তুমি এটারে প্লেটোর সংলাপ কইছ ক্যান?

: আসলে গ্রিক দর্শন নিয়ে বহু বছর আগে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এই কাজটুকুই আমি প্রথমে করেছিলাম আমাদের তরুণ সমাজকে প্লেটোর সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য। তাতে যতোটুকু সার্থকতা পেয়েছি, টাকা-পয়সা না পেলেও, সেটাই আমার বড়ো প্রাপ্তি। আমাদের প্রিয় ডাক্তার নন্দীর কথা তোমার মনে আছে?

: হ্যাঁ, আছে, ডক্টর নন্দী। ডক্টর মন্মথ নন্দী। ওয়ারীতে নিজের বাড়িতে নিজের উদ্যোগে সকলের জন্য হাসপাতাল বানিয়েছিলেন। হক সাহেব থেকে শুরু করে সরকারের কোনো কর্তাই ডক্টর নন্দী ছাড়া অপর কারুর দ্বারা নিজেদের কোনো রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা করাতেন না।

: একদিন তিনি আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

আমি বললাম : কী অভিযোগ?

: আমি গতরাতে ঘুমাতে পারিনি।

: ক্যান?

: আপনি সেই যে আমাকে 'প্লেটোর সংলাপ' দিলেন, তার পাঠ শেষ না করে আমি ঘুমাই ক্যামন করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজাফফরকে বললাম : এও আমার এক প্রাপ্তি।

: তোমরা পণ্ডিতরা আরো সহজ কইরা লিখতে পারো না?

: বলছো ঠিকই। গ্রিক দর্শন, কঠিন তো একটু লাগবেই। আর তাছাড়া 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। তোমার কাছ থেকে আজ যা পেলাম, তাওতো আমার আর এক স্মরণীয় প্রাপ্তি।... বহুক্ষণ চললো।

তারপরে এক সময়ে ও থামলো। আমি বললাম, ঠিক আছে আজ থাক। আবার ফোন করো।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আমি নিজের কাছেই বললাম : মুজাফফর এখনো মুজাফফরই আছে। সেই বক্রভঙ্গিতে কথা বলা। স্মরণ রাখার নিদারুণ ক্ষমতা। কাউকে খোঁচা দেওয়া বাদে কিছু না বলা।

মুজাফফর 'প্লেটোর সংলাপ' পড়ে খুশি হয়েছে, এটিই বড়ো কথা।

শেখ হাসিনা দেশে নেই। সরকার তার বিরুদ্ধে আরো মামলা দায়ের করেছে। আজ ৩ তারিখে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক ছিল। হরতাল সফল হয়েছে। সকল মাধ্যমই বলছে। মতিয়া চৌধুরী সব সময়ের মতো আজো নেতৃত্ব দিয়েছেন, মেয়েদের সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে উঠেছেন, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, টানাটানি হয়েছে। এক সময় তিনি নাকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আসাদুজ্জামান নূরও অন্যদের সঙ্গে মিলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আজকের এই সাফল্যের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গতকালের ভোট-প্রহসনের পরে। আজ ছিল বস্তুত আওয়ামী লীগের দিন।

: ৪-৭-২০০৪ : রোববার ॥ তার মানে ৪ জুলাই। গতকাল ৩ জুলাই ছিল আওয়ামী লীগের হরতাল। একদিকে দেবো ব্যাটাদের শেষ করার ভাব : অপরদিকে আওয়ামী লীগের অসহায় অবস্থা।

গতকাল হরতালের মধ্যে কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ঘরের মধ্যে দেয়ালে কান পেতে রেখেও কিছু বুঝলাম না : কোথায় কী হচ্ছে, আর হচ্ছে না। মনে হয়েছিল যেন সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু রাতে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেলো—মতিয়া চৌধুরী আর তার সঙ্গিনীদের ওপর পুলিশের উদ্দাম লাঠির বাড়ি আর জামাকাপড় ধরে টানাটানি। সরকারের বিরুদ্ধে হাজার লোকের বেরুবার কথা মুখের কথা নয়। তবু শত শত মানুষ বেরিয়েছিল। দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও বলা সম্ভব হয়নি : হরতাল হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিভিশনে এসব দৃশ্য দেখে বেদনার্ত মনে কেবল প্রশ্ন জেগেছে, কোথায় যাচ্ছে দেশ?

এই মনোভাব নিয়ে ভোরের কাগজের একটি পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম, সেই 'চরমপত্রের' প্রয়োজন। সেই '৭১-এর মতো, এবং একাত্তরের অধিকরূপে আজকে, ২০০১-এর পরে ২০০৩ তো বটেই, তার অধিক আজকের ২০০৪-এ।

আজ আর এম আর আখতার মুকুল নেই। তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ। সেদিন মুকুল স্বাধীনতাযুদ্ধে রত মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানের বন্দী এবং জিম্মি লাখ লাখ বাঙালির আশার কণ্ঠ হয়ে হাসিতে, ঠাট্টায়, পাক বাহিনীর অধমতার আদ্যোপান্ত তাঁর তুলনাহীন ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে ঢাকাইয়া ভাষায় উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছিলেন।

বর্তমানে আমরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যামূলক বিভক্তিতে বিভক্ত হওয়ায় আমাদের দেশের মূল অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন হয়ে পড়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির প্রত্যেকের হাত প্রত্যেকের হাতের সঙ্গে মেলাবার প্রয়োজন, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার মৌলিক ক্ষেত্রে মিলিত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে আমরা একদিকে ব্যস্ত আর অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত এবং বৈরীশক্তি আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে প্রতিশোধের আওয়াজ তুলছে : নানা কায়দায়, নানা ভঙ্গিতে, নানা ওসিলায়, নানা অজুহাতে।

এই ব্লুপ্রিন্টের আর এক প্রকাশ ঘটেছে মেয়েদের দিয়ে কুস্তি খেলা দেখানোকেই একদিকে আমাদের প্রধান অধিকার বলে আওয়াজ তুলে এবং অপরদিকে এই অজানা মেয়ে এবং তাদের পেছনকার উসকে দেওয়া এই পাতানো কুস্তি খেলার উদ্যোক্তাদের দ্বারা মৌলবাদীর এ গোষ্ঠী, সে গোষ্ঠীকে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেওয়াতে। আজ সাড়ে সাতটার বিবিসি পর্যন্ত এই ঘটনাকে বাংলাদেশের প্রধান ঘটনা বলে প্রচার করেছে। টেলিভিশনে এ খবর নিশ্চয়ই অধিকতর উত্তেজকভাবে প্রচারিত হবে।

'একে বলে নাই কাজ তো খৈ ভাজ।'

তাই ভাবছিলাম, কোন মারাত্মক ব্লুপ্রিন্টের শিকার হয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানতে উদ্যত হচ্ছি : আমাদের অনৈক্য এবং চেতনাহীনতার মধ্য দিয়ে?...

০৩.০৭.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেয়াল ক্যালেন্ডারের সংস্কৃতি

আমার অবুঝ ছেলের ধাক্কাটা গত রাতে সামলেছি। আজ এবং আর কয়েকটি দিন হয়তো একটু নিরুদ্বেগে কাটাতে পারবো। অনেকদিন যাবৎ ভেবেছি, আমাদের দেয়াল ক্যালেন্ডারের সংস্কৃতি বলে একটু লেখা তৈরি করি। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন যে ক্ষমতা, তা আমার নেই। তবু একেবারে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে না। তাই এই চেষ্টা। আগে ছিল পকেট পঞ্জিকা। তাতে তিথি-নক্ষত্রের হিসাবসহ বাংলা, ইংরেজি, আরবির তারিখ থাকতো। তিন-চার টাকা দামে হয়তো পাওয়া যেতো। গ্রাম এলাকায় এর ব্যবহার হতো। শহরে এর ব্যবহার আমি ততো দেখিনি। পরে ক্রমান্বয়ে ছবিসহ এবং বড়ো হরফে তারিখসহ বৃহৎ আকারের দেয়াল ক্যালেন্ডার কবে থেকে শুরু হয়েছে তার হদিস আমার জানা নেই। ইংরেজি হিসেবে বছরের শেষ, মানে নভেম্বর, ডিসেম্বর এলেই নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের দেখা পাওয়া যায়; রাস্তায় হকারদের কাছে, স্টেশনারি এবং ফটোগ্রাফির দোকানে।

আজকালকার দেয়াল ক্যালেন্ডারের প্রধান উদ্যোক্তা আমাদের ব্যাংকসমূহ। আমার ধারণা প্রত্যেকটি ব্যাংকের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বাৎসরিক দেয়াল ক্যালেন্ডারের মুদ্রণ এবং তাকে ব্যাংকের পরিচিত ক্লায়েন্ট তথা গ্রাহকদের সেই ক্যালেন্ডারের কপি উপহার হিসেবে প্রদান একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের তরফ থেকেও দেয়াল ক্যালেন্ডার তৈর করা হয়। তাতে সরকারি ছুটির খবর থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত বিশেষ দিনগুলোর তারিখ লাল রঙের কালিতে ছাপা হয়। তার মূল্যও থাকে। সরকারি ক্যালেন্ডারে খুব যে ছবি থাকে, তা মনে হয় না। অবশ্য আজকাল উপরের দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি মুদ্রিত হতে দেখা যায়। নতুন বছর এলে বিগত বছরের দেয়াল ক্যালেন্ডার দেয়ালের পেরেক থেকে নামিয়ে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে আমরা রাখি। তার জায়গাতে নতুন বছরের দেয়াল ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে দিই।

আমার কয়েকজন আত্মীয় আছেন, কেবল আত্মীয় নন, বন্ধু আছেন যারা বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তা।

AMARBOI.COM

আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। আমার একটা প্রয়োজন বেশ একটা দূর থেকেও যেন তারিখগুলো আমি দেখতে পাই। তারিখগুলোর অক্ষর যেন একটু বড়ো আকারের হয়।

বাজারের বা স্টলের দেয়াল ক্যালেন্ডার বেশ কয়েক পৃষ্ঠা হয়। ১২ মাসের ১২ পৃষ্ঠা ক্যালেন্ডার না হলেও ছয় পৃষ্ঠা হয়। পাতার আকার বড়ো বলে এর পৃষ্ঠার বামপাশে এক মাস এবং ডানপাশে আর এক মাসের তারিখ ছাপা হয়। বছরান্তে আর পুরনো বছরের ক্যালেন্ডার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার দরকার হয় না। সম্ভবও হয় না। দেয়াল ক্যালেন্ডার আমার নানা উপকারে আসে। তারিখের ঘরগুলো একটু বড়ো আকারের থাকে বলে সেই তারিখগুলোতে আমার ক্ষুদে অক্ষর দিয়ে আমার দৈনিক জীবনের কিছু প্রয়োজনীয় বা করণীয়ের কথা টুকে রাখতে পারি। শুক্রবার অফিস-আদালত ছুটি থাকে। অনেক বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের দেখা সাক্ষাতের কথা ঐ তারিখে লিখে রাখি।

একটি দেয়াল ক্যালেন্ডার থেকে আর একটি ক্যালেন্ডারের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য হয় তাদের প্রাকৃতিক কিংবা অপর কোনো বিষয়ের বাহারে এবং রঙ-বেরঙের ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্রের প্রদর্শনীতে। কক্সবাজারের সমুদ্রের পূর্ব কিংবা পশ্চিমের দিগন্তে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের ছবি আমার মনকে উদ্দীপিত করে।

নতুন বছরে পুরনো বছরের দেয়াল ক্যালেন্ডার বদলাতে হয়। কিন্তু আজ যে কথা লিখে রাখার জন্য এই সকালে কলম ধরেছি, একটি বিশেষ ব্যাংকের কয়েক বছর আগের একটি দেয়াল ক্যালেন্ডার এখনো আমার দেয়ালে টাঙানো আছে দেখে। 'এনসিসি' ব্যাংকের ২০০২-এর সাত পৃষ্ঠার বৃহৎ আকারের ক্যালেন্ডার। 'এনসিসি' ব্যাংকের পুরো নাম হচ্ছে 'ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড'।

২০০২ সালের সাত পৃষ্ঠার ক্যালেন্ডারটির উদ্বোধনী পৃষ্ঠাটি কেবল যে শূন্য রাখা হয়নি, তা না। উদ্বোধনী প্রথম পৃষ্ঠাটিতে মাসের তারিখ নেই। পৃষ্ঠার উপরের দিকে সাতটি দুর্লভ পোর্ট্রেটের সমুদ্রণ রয়েছে। এদের সাতটি নামই যেন আমি ভুলে না যাই, তার জন্য আজ এই ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে দেয়াল থেকে পুরনো সেই ক্যালেন্ডারটি নামিয়ে তার ধুলো মুছে নাম কয়টিকে আমার আজকের দিনলিপির পাতায় না লিখে পারলাম না।

পোর্ট্রেট কটির প্রথমটি হচ্ছে কিংবা হচ্ছেন কিংবদন্তির নায়ক হোমার। ক্যালেন্ডারের উদ্যোগীরা তাদের মুদ্রিত পোর্ট্রেটগুলোর জীবনকালের পরিচয় দিলে আমি অধিকতর উপকৃত হতাম। তাদের নামে আছে, কিন্তু জীবনকালের উল্লেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। আমার হাতের কাছে যে কটি এনসাইক্লোপিডিয়া বা জীবনকোষ আছে, তাদের মধ্যে খুঁজে পেতে আমি আমার প্রয়োজনেই তাদের জীবনকালকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম। এদের মধ্যে হোমারই অবশ্য এক্ষেত্রে কঠিন তথা আনুমানিক। একটি জ্ঞানকোষের বক্তব্য হচ্ছে, হোমার কে ছিলেন আর কোথায় ছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে এখনো স্থির হয়নি। তবু 'হোমার' নামটি বাদে পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোনো আলোচনা হয় না। ঐতিহাসিকরাও এ ব্যাপারে বলেন যে, 'ইলিয়াড' এবং 'অডিসি' নামক যে দুখানি গ্রিক মহাকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের রচয়িতা কে বা কারা তা এখনো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। নানাভাবে হিসাব-নিকাশ করে গবেষকরা বলেন যে, এই দুখানি মহাকাব্য আনুমানিক 'বিসি' বা খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে হয়তো অষ্ট বা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত এবং হাটে-বাজারে এ কাব্য গীত হতো।

এরপরের পোর্ট্রেটটি ইতালিয়ান কবি ভার্জিলের। তার জীবনকাল মোটামুটি নির্দিষ্ট এবং খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৭০ থেকে ১৯। তৃতীয়টি কবি দান্তে। তাঁর জীবনকাল খ্রিস্টাব্দ ১২৬৫-১৩২১। চতুর্থটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ইতিহাস বিখ্যাত ইল্যান্ডের কবি ও নাট্যকার। তার জীবনকাল খ্রিস্টাব্দ ১৫৬৪-১৬১৬। পঞ্চমটি জার্মানির কবি গ্যেটে। তার জীবনকাল খ্রিস্টাব্দ ১৭৪৯-১৮৩২। ষষ্ঠটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার জীবনকাল খ্রিস্টাব্দ ১৮৬১-১৯৪১ এবং সপ্তমটি কাজী নজরুল ইসলাম। তার জীবনকাল ১৮৯৯-১৯৭৬।

উদ্বোধনী পৃষ্ঠাটিতে একটি উদ্বোধনী বক্তব্য মুদ্রিত হয়েছে। তার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, মহাকালের অভিযাত্রী। পাঁচটি অনুচ্ছেদে ৩০ ছত্রের অধিকে উদ্বোধনী মহৎ বক্তব্যটি মুদ্রিত হয়েছে। উদ্বোধনী বক্তব্যটি কেবল মহৎ, তাই নয়, ত্রুটিহীনভাবে সুমুদ্রিত। উদ্বোধনী পৃষ্ঠার পরের বাকি ছটি পৃষ্ঠার একটিতে রয়েছে গ্রিক ভাস্কর্যের প্রতিলিপিসহ হোমারের পোর্ট্রেট। এর পরেরটি মার্চ-এপ্রিলের পৃষ্ঠাটিতে আছে প্রাচীন রোমের ভাস্কর্যের প্রতিচিত্রসহ কবি ভার্জিলের প্রতিকৃতি। মে-জুন মাসের পৃষ্ঠাটিতে প্রায় পৃষ্ঠাব্যাপী কবি দান্তের পরিচয় এবং কাহিনী। জুলাই-আগস্ট পৃষ্ঠায় সুন্দর মুদ্রণে মুদ্রিত হয়েছে শেক্সপিয়ারের জীবনকাহিনী। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের পৃষ্ঠাটিতে কবি গ্যেটের প্রতিকৃতিসহ তার জন্মভূমির আলোকচিত্র। নভেম্বর-ডিসেম্বরের শেষ পৃষ্ঠায় বাঁপাশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী ধ্যানমগ্ন একটি প্রতিকৃতি এবং পৃষ্ঠার ডানপাশে বাঙালি মাত্রের প্রাণের মানুষ এবং সংগ্রামের প্রতীক কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি অবিস্মরণীয় প্রতিকৃতি, দূরদিগন্তে প্রসারিত দৃষ্টিসহ বুকের উপর আবদ্ধ তার সরল দুটি হস্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনসিসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশংসনীয় বিবেচনা দেখিয়েছেন উদ্বোধনী থেকে প্রতি পৃষ্ঠায় পরিচয়লিপির লেখকের নাম উহ্য রেখে। তাই তারা সকলেই আমার কাছে 'নামহীন'। তবুও আমি যেমন এনসিসি ব্যাংকের ২০০২ সালের দেয়াল ক্যালেন্ডারটির এমন পরিকল্পনা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যের জন্য এবং এমন শিল্প-সৌকর্যের বাহক হিসেবে এমন একটি যে ক্যালেন্ডার দুবছর আগে তৈরি করেছিলেন দুবছর পরে হলেও তার বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আমার দিনলিপিতে একটু আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করলাম বলে আজকের এই দিনলিপিটি।

আমি এমন শিল্প ও সংস্কৃতি কর্মের উদ্যোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেখি ক্যালেন্ডারটি আমার জীবনের দেয়ালে আর কবছর রক্ষা করতে পারি।

১৮.০৪.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাংকের টেবিলে রবীন্দ্রনাথ

মনকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে দায়িত্ব পালনে বেরুতে হয়েছিল ১০টার দিকেই। প্রথমে সোবহানবাগে আমার পরিচিত ফটোস্ট্যাটের দোকানে। একটি সিএনজি পেয়ে অনেক অনুরোধ করে রাজি করালাম। মিটারে গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোনালী ব্যাংকের শাখায়। ম্যানেজার আলতাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব ছিলেন। দীলিপও ছিলেন। উত্তমও। আর এই ঘরেই দেখা হলো অনেকদিন পরে ড. আকমল হোসেনের সঙ্গে। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান। বয়সে আমার অনুজ বটে, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও কম নয়। বগুড়ার দিকে বোধ হয় বাড়ি। সেই সেকালের বাড়িঘর, উঠানের তালগাছ; সবকিছুর স্মৃতি জাগল। সে সব কথা বললেন। আমাকে খুব প্রীতি আর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে কাঁচের নিচে বেশ কয়েকটি সত্য বাক্য বড় হরফে খোদা ছিল। আমি লেখনীর একটু কাঁচামাল হিসাবে, ১০/১১ ছত্রের কবিতার আঙ্গিকে মুদ্রিত সৎ বাক্য কয়টি আলতাফ সাহেবের কাছ থেকে একটি প্যাড চেয়ে নিয়ে লাইন ক'টি টুকতে লাগলাম। শেষে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর দেখে লাইন ক'টিকে ভাল না লেগে পারে না। কিন্তু মুদ্রণে যা একটু ত্রুটি নজরে এলো তাতে মনে হলো, হয়তো এটি কবির রচনা নয়। তবু ভাল কথা তো আমিও কবিতার আকারে লাইন ক'টি, ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে নেয়া কাগজে লিখে নিলাম আমার একটি দিনলিপির কাঁচামাল হিসাবে :

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না,
আড়ম্বর করি, কাজ করি না।
যাহা অনুষ্ঠান করি তাকে বিশ্বাস করি না,
যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না,
ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি
তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।
আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি;
যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা
করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ
করিতে থাকি॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির স্বাক্ষরটি মুদ্রিত : যে কোন জায়গায়, যে কারুর দ্বারা কবির নামের স্বাক্ষরটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দেখা যায়। তবু আমি খুশি ছাড়া অখুশি হলাম না। এটাও তো আমাদের সংস্কৃতি জগতের একটি বিবর্তনের পরিচয় বহন করে। পাউন্ড, ডলার, টাকা বিনিময়ের বদলে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সজ্জিত মহৎ চিন্তার একটি কথামালা।

এই আলতাফ চৌধুরী সাহেবের কেবল আমার প্রতি প্রীতি আর সৌজন্য নয়। সকলের জন্যই তাঁর যে উদ্বেগ ও পরিশ্রম, নিজের সামনের কম্পুটারের পয়েন্টগুলো টিপে যিনি যা চান, মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে তা দিয়ে খুশি করেন। দরকার মতো উঠে, নিজের দরজার ঘরের বাইরে বেরিয়ে উত্তর মাথায় কারুর চেক পাস করিয়ে আনেন, কারুর এ্যাকাউন্ট নম্বর বলতে না পারলে তাঁর নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করে ক্লায়েন্টের বিস্মৃত সেট নম্বরও উদ্ধার করে দেন।

আমার স্ত্রীকে এঁরা সবাই চিনেন। যে মহিলার কাছ থেকে আগে পাশের ঘর থেকে টাকা নিতাম, তাঁর নামটি যাই হোক, তিনি যেমনি হাসিমুখ, তেমনি কর্মপটু। তাঁর নিজের আঙ্গুলে গুনে দেওয়া টাকাকে আমি কোনদিন দ্বিতীয়বার গুনে দেখার চেষ্টা করিনি। তিনি বলেছেন, একটু দেখে নিন। আমি বলেছি, আপনি দেখার পর, আমি দেখব না। এমন সুন্দরভাবে টাকা গোনেন কেমন করে! আমার প্রশংসায় তিনি খুশি হন। কয়েকদিন তাকে পাচ্ছিলাম না। জানতাম না তাঁকে ব্যাংকের উত্তর মাথার 'কাউন্টার চত্বরে' ম্যানেজার সাহেব অধিকতর গুরুতর দায়িত্ব দিয়েছেন। আজ ম্যানেজার সাহেবের ঘরের দিকে আসতেই দেখা হওয়াতে আমি খুশি হয়ে বললাম।

: এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনাকে মিস্ করেছি। খুব খুশি হয়ে বললেন : আমার ভাগ্য। আপনি মনে রেখেছেন। তিনি বললেন : বেগম সাহেব কেমন আছেন?

: তা তো জানিনে!

তার মানে?

: তিনি যদি কাল এসেছেন, তো আমি আজ। তিনি যদি দক্ষিণে যান, আমি উত্তরে। আমার কথায় রহস্যের সন্ধান পেয়ে তিনি বলেন : এ ক্যামন কথা? আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে অভয় দিই। না, না, চিন্তা করবেন না। আমরা ঝগড়া করিনে। আর তিনি আমার চাইতে বেশি শিক্ষিতা, আমি যদিও কেবল এমএ। তিনি এমএ বিটি।

: অথচ তাঁকে দেখলে বোঝাই যায় না!

এটিও তাঁর প্রশংসার কথা।

তাই বলছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরামহীন স্লোগানমুখর এলাকার সোনালী ব্যাংকের এই শাখাটিকে আলতাফ চৌধুরী সাহেব যেমন কর্মচঞ্চল রেখেছেন, তেমনি তার পরিবেশটিও আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। যে-কোন বিপদ-বিঘ্নে ম্যানেজার সাহেবের সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারটি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

আমার ব্যাপারে তিনি আরও বেশি। দরজার বাইরে আমাকে লাঠি হাতে আসতে দেখলে নিজের চেয়ার ছেড়ে যেমন হাসিমুখে এগিয়ে আসেন, তেমনি আবার আমার কাজ শেষে বেরুবার সময়ে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে প্রায় গেট পর্যন্ত এগিয়ে না দিয়ে আমাকে ছাড়বেন না। যত বলি : আপনার কাজের অসুবিধা হবে। আমি যেতে পারব। তিনি তত হাসিমুখে এগিয়ে দিতে দিতে বলবেন, আপনার হাত ধরে, একটু এগিয়ে দিতে না পারলে, আমার যে আরও বেশি দুঃখ আর অনুশোচনা হবে।

এমন কথার কি জবাব দেওয়া যায়?

আমি বলি, এমনভাবে খাতির করলে আপনার চাকরির মেয়াদ কমে যাবে।

তাই নাকি! মেয়াদ ২৭ বছর তো পেরিয়ে গেছে।

আমার যাতায়াতের এও এক স্মরণীয় স্মৃতি। আমার দিনলিপিতে আনতে পারিনে বলেই আমার দুঃখ। এই তো আমাদের জীবন : প্রীতি এবং সৌজন্যের!

আসার সময়ে দীলিপের ঘরে একবার ঢুকে বললাম : কাজ করুন। কিন্তু আপনার একাত্তরের অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু শেষ হয়নি। আমাকে তা পুরো বলতেই হবে।

দীলিপ হেসে বলেন : না, না, আমি বলব তো!

০৮.০৭.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে প্রায় একটা টাকাও না থাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ১১টার দিকে ইউনিভার্সিটির ব্যাংকের জন্য বেরুলাম। দুই একটু চিন্তা করলাম। চিন্তা না করলে ঠিক করতে পারিনে, কাঁধের ব্যাগে কি নিলাম, আর কি নিলাম না।

ঠিকই, চিন্তা করতে মনে পড়ল; আজ যখন বেরুতে পারছিই, তখন দেখি কলির 'হজকথা'র প্রিন্ট অরডারটা মাওলা ব্রাদার্সে পৌঁছে দিতে পারি কিনা। সেই দাক্ষিণাত্য তথা সদরঘাটের বাংলাবাজারে।

মাওলা ব্রাদার্সের আসল মানুষ যে, সেই মামুন কয়েকদিনের জন্য চলে গেছে কোলকাতায়। তা আমি জানি। তবু 'হজকথা'র প্রুফ, পরিশিষ্ট ইত্যাদি যদি মামুনের বিশ্বস্ত কর্মী সুদীপ, তপন বা চিন্ময়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তবে তারা কাজ কিছু এগিয়ে রাখতে পারবে।

আমার সত্যি একটা চিন্তা, কলির 'হজকথা' প্রকাশ না করে যদি কাল কিংবা পরশু মারা যাই, তবে কলির মন জ্বলবে, লোকটা নিজের বই কত বার করল। কেবল আমার বইটার সময়েই ফাঁকি গেল! এটা ঠাট্টা নয়। আমার যথার্থ চিন্তা।

তাই কলির পাণ্ডুলিপিটাও কাঁধের ব্যাগে ভরে বেরুলাম। রাস্তায় বেরিয়ে মাওলায় একবার ফোন করলাম। সুদীপ ছিল। বলল : স্যার আপনি চলে আসুন।

তাই রওনা দিলাম। প্রথমে রিক্সা করে ইউনিভার্সিটি ব্যাংকে। কিছু টাকা তুলতে বেশি সময় লাগল না। ব্যাংকের গেটে যে গার্ড বসে থাকেন। তিনি আমাকে দেখলেই সমাদরে বলে ওঠেন; স্যার, কেমন আছেন? আমি আনন্দে তাঁর গায়ে হাত রেখে বলি : ভাল, আপনি ভাল তো?

ইউনিভার্সিটি এলাকা প্রায় নীরব। এখানে, ওখানে আর্মড গার্ড আছে। অফিসেরও কাজকর্ম বোধহয় তেমন চলছে না। ক্লাস সব ঘোষণা দিয়েই ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ১লা অক্টোবর তো ভোট। তাই এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কলাভবনের দিকে গিয়েও লাভ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেটের কাছে একটি খালি বেবি পেলাম। বাংলাবাজারের কথা বললেও না করল না। রাজি হল। বলল : পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকাও কমাতে পারলাম না। তাই সই।

হাতের লাঠিটা যুত করে ধরে সিটে বসতেই দেখি একটি সুকুমার তরুণ বেবির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। আমি বিব্রত হয়ে 'না, না, করেও থামাতে পারলাম না।

আমি বললাম : আরে, আরে এ যে বিস্ময়। আজকাল তরুণরা বৃদ্ধদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে না। বৃদ্ধরাই তরুণদের সালাম করে। তাই তো করা উচিত।

তরুণটি কথায় কম গেল না।

: স্যার আমি মামুন। সাংবাদিকতায় এমএ করেছি। আমি 'জনকণ্ঠে'র সঙ্গেও জড়িত আছি।

ওর কথা শুনে খুব খুশি হলাম। বললাম : পরে যখনি দেখা হবে, নিজে এগিয়ে এসে আলাপ কোরো। তখন তোমার সঙ্গে আরো কথা বলব। মামুন বলল : স্যার আপনার কথা মনে হলে, আমাদেরও ভাল হতে ইচ্ছা হয়।

হাত তুলে মামুনকে বিদায় জানিয়ে বেবিকে বললাম : চলুন।

বেবিতে যেতে যেতেও মামুন ছেলেটির শেষ কথাটি মনকে নাড়া দিতে লাগল। ওর কথায় কোন কৃত্রিমতা ছিল না : স্যার আপনার কথা মনে হলে, আমাদেরও ভাল হতে ইচ্ছা করে।...

বাংলাবাজারে মাওলা ব্রাদার্সে মাহমুদের কর্মী সুদীপের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাইয়ে আপ্যায়িত করল। পাণ্ডুলিপির কাজ বুঝে রাখল। কলির পাণ্ডুলিপির সবটা : তার একটি পোর্ট্রেট, আমার লেখা পরিশিষ্টটি এবং জ্যাকেটের ফ্ল্যাপের জন্য একটু পরিচয়ও তৈরি করে দিয়েছি। বাংলাবাজার থেকে আবার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সোজা বাসায় না এসে, এলাম শাহবাগে বাবুল ইলেকট্রনিক্স-এর পূর্ণবাবুর কাছে। আমাকে দেখে খুশি হলেন। কিন্তু না কিছু খাওয়াবেনই। নিজে পানি গরম করে কফি বানিয়ে খাওয়ালেন।

'জনকণ্ঠে' বোধহয় গতকাল আমার একটু ব্যক্তিগত ধরনের রচনা : যে লেখা, লেখা নয় বেরিয়েছিল। তার একটি শিরোনাম ছিল : 'হোয়াট ম্যান ডাজ টু ম্যান!' লেখাটুকুর মধ্যে আমেরিকায় সাম্প্রতিক অবিশ্বাস্য বিধ্বংসী ঘটনার উপরও দু'একটি মন্তব্য ছিল। শেষ বাক্যে বলেছিলাম : এই হচ্ছে, আজকের এই মুহূর্তের পৃথিবী। এটা কি মানুষের পৃথিবী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম, এটিও পূর্ণবাবুর নজর এড়ায়নি। এটিও তিনি সংগ্রহ করে পড়েছেন। আমার কোন কিছুকেই তিনি বাদ দেন না। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আজকের নয়। বিশ বছরের অধিককালের। আমার মতোই পুরনো দিনের বিশ্বাস ও আচরণের মানুষ। তাই দেখা হলেই পরস্পর পরস্পরকে অভয় দিয়ে বলি : চিন্তা করবেন না। এই তো জীবন। এর মধ্যেই তো জীবন। যতদিন, ততদিন।...

আজকের, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের 'জনকণ্ঠে'ই খবর বেরিয়েছে : বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গতকাল পরলোকগমন করেছেন। কোলকাতায়।

আমার জন্যও এটি খুবই দুঃখের খবর। এ জন্য নয় যে, আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত থেকে দেখছি, তার জন্ম ১৯৩৩ সালে। তাই সময়ের দিক থেকে (২০০১-১৯৯৩ = ৬৮) মাত্র ৬৮ বছর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বয়স হয়েছিল, এমন বলা যায় না। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানতাম না। তবু আমি ব্যথিত। আমি তাঁকে চিনি তাঁর ঐতিহাসিক দুখণ্ড উপন্যাসের মাধ্যমে; 'শাহজাহা দারাশুকো'র কথা শুনে। তাও ঢাকায় কারুর কাছ থেকে শুনে নয়। ঢাকায় সাহিত্যিক বন্ধুমহলে তিনি তেমন আলোচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। আমি গল্প-উপন্যাস বেশি পড়তে পারিনে বলে তাঁর বই ঢাকার বাজারে পাওয়া গেলেও আমার তেমন পড়া হয়নি।

AMARBOI.COM

কিন্তু হঠাৎ তাঁর নাম শুনলাম। সেও কয়েক বছর আগের কথা। আমার একজন স্নেহভাজন। নাম খোকন। আমার স্ত্রীর ছোট ভাই। ইঞ্জিনিয়ার। বেশ কয়েক বছর আগে জীবিকার অন্বেষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিল। থাকত নিউইয়র্কেই। বছরে কিংবা দু'বছরে ঢাকায় আসে। আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হয় তখন।

এভাবেই একবার ঢাকা এসে আমাকে বলল : দুলাভাই, আমাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দারাশুকো যোগাড় করে দিন। ভারতের একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক।

তখনি মাত্র আমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শুনি। আমার সেই স্নেহভাজনের তাগিদে আমি তখন ঢাকার বই-এর বাজারে খোঁজ করে 'শাহজাদা দারাশুকো'র ১ম ও ২য় খণ্ড সংগ্রহ করে ওকে এক সেট দিই এবং আর এক সেট নিজের জন্য রাখি। খোকন বলেছিল নিউইয়র্কের বাঙ্গালী মহলে শাহজাদা দারাশুকোর খুব আলোচনা।

সে কথা শুনে আমার ব্যক্তিগত জীবনের অসুবিধার মধ্যেও আমি 'শাহজাদা দারাশুকো'কে পাঠ করি। তখন তার আবেগে একটি ব্যক্তিগত রোজনামচাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলাম। শিরোনাম দিয়েছিলাম : 'শাহজাদা দারাশুকো ভায়া আমেরিকা'। তার পরে বই দু'খানাকে যত্ন করে আলাদা করে আমার বইয়ের স্তূপের মধ্যে রেখে দিই। ইচ্ছা এই ছিল, আবার আমাকে শাহজাদা দারাশুকো পাঠ করতে হবে। এ বই একবার পাঠ করে বলা যায় না যে, আমি পাঠ করেছি।

তার পরেও শ্যামল বাবুর অন্য কোন গ্রন্থ যে সংগ্রহ করে পাঠ করতে পেরেছি, তাও নয়। বন্ধুদের কাছে শুনেছি, তিনি ঢাকার কোন একটি কাগজে তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছেন। আগ্রহ ছিল সেই পত্রিকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করে দেখব, কেমন হচ্ছে শ্যামল বাবুর আত্মজীবনী। শ্যামল বাবু আমাদের পূর্ববঙ্গেরই লোক। তিনি জন্মেছিলেন খুলনায়।

ঢাকায় যদি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর কোন আলোচনা হয়, তবে তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার জন্য এমন আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার আমি চেষ্টা করব।...

২৫.০৯.২০০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরের সংগ্রাম

ঘুম ভেঙ্গে গেল ৫টার দিকেই। এখন কি করব? শেষ পর্যন্ত একান্তে এবং একান্ত আমার পাঁচ হাত-বাই-দশ হাতের খুপরীটিতে বাতি জ্বালিয়ে বন্ধুবর মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মাধ্যমে একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিরকুটসহ প্রেরিত আমার অ-দৃষ্ট মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের 'সুন্দরের সংগ্রাম ও বুদ্ধিবাদের ট্রাজেডি' শিরোনামের বইখানিকে আমার কাঁধের থলে খুঁজে বার করলাম। বেপরোয়া হয়ে বার করলাম এই ভয় থেকে যে, আর দেরী হলে এ বই একেবারেই হারিয়ে যাবে কিংবা আমিই একেবারে হারিয়ে যাব। বাতি জ্বালালাম, বইখানির সূচিপত্রের শিরোনামগুলির দিকে আবার একটু চোখ বুলালাম : প্রায় রচনারই বেশ পূর্ণ কিংবা দীর্ঘ শিরোনাম। আলোচিত বিষয়ের স্বব্যাখ্যাত শিরোনাম। হিসেব করে দেখলাম অন্ততঃ ২৪টি শিরোনাম। আজকের দিনলিপিতে সব কটির আর উল্লেখ করলাম না। যে কয়েকটির করছি তার মধ্যে আছে : সাহিত্যের শিলালিপি ও জনঅক্ষৌহিনীর ভবিষ্যৎ; পূর্ববাংলার সংস্কৃতি আন্দোলন; পূর্ববাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ভবিতব্য; গৌরকিশোর ঘোষের 'কমলা কেমন আছে?' মুনীর চৌধুরী, তাঁর জীবনীগবেষক আনিসুজ্জামান ও বুদ্ধিবাদের ট্রাজেডি; বাঙালীর বিজয়, বাঙালীর সংশয়; বাঙালীর ইচ্ছাপূরণে অনিচ্ছা; বুদ্ধিবাদের ট্রাজেডি এবং একটি ক্যালেন্ডার ও একজন অশরীরীর ইতিকথা। সূচিপত্রের নামের এই উল্লেখ থেকেই আমি বুঝতে পারছি এর কোন রচনাই মিষ্টিদ্রব্যের মতো মুহূর্তে চিবানো বা গলাধঃকরণের বস্তু নয়। আমি যে-অপাঠক এবং ধীরপাঠক, তাতে এ গ্রন্থের পাঠ আমার শেষ হবে না। তার পূর্বেই আমি নিঃশেষ হব। এটা আতঙ্কের কথা নয়। বাংলাদেশের নিত্যদিনের পরিবেশে এটি নিশ্চিত কথা। তবু যে কয়দিন : সে কয়দিন বইখানিকে হাতের কাছে রাখব, আমার মাথার বালিশের নিচে রাখব যেন রাত তিনটার দিকেও বালিশের নিচে হাত দিলেও এর দিশা পাই। আমার জীবনে এ বইটি আসা উচিত ছিল আরো দশ বছর আগে। কিন্তু সে কথাও সত্য নয়। দশ বছর আগে এলে কি হতো। সে সময়ের মধ্যে কি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তিনটা ক্ষতিকর আঘাত ঘটত না? তাছাড়া এই আঘাত এবং দিনাদিনের অভিজ্ঞতাই বা কোথায় পেতাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব ফজুল কথার বাইরে নিজেকে নিজে এখন, পূর্ব আকাশটি একটু আলোময় হয়ে ওঠার মুহূর্তে যে কথাটি বললাম সে হচ্ছে এই : না আজ অন্তত নজরুলের সেই লেখাটি পড়তে হবে যার শিরোনাম দিয়েছেন তিনি : 'বিস্ময়কর অথচ বিভ্রান্ত এক জাতি ও শেখ মুজিবুর রহমান নামক এক ধ্রুবতারা'।

বন্ধুবর নজরুল বেশ চিন্তা করে তাঁর রচনার এমন দীর্ঘ শিরোনাম তৈরী করেছেন। আমি শিরোনামটিতে যেমন চমকিত হয়েছি, তেমনই এর যথার্থতাকে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। রচনাটি পাঠ করলে এর যথার্থতাকে চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই অনুধাবনে কোন অসুবিধা হবে না। এর একাধিক বাক্যের নিচে আমি লাল পেন্সিলের টানে তার গুরুত্বকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। মনে করেছিলাম, এই বাক্যগুলিকে আমার দিনলিপিতে টুকে রাখব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তাও অর্থহীন। নজরুল যখন সশ্রদ্ধভাবে তাঁর সুহৃদ অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মাধ্যমে গ্রন্থখানিকে আমাকে পাঠিয়েছেন, তখন তাঁর সেই ঔদার্যে এ বই তো আমার সংগ্রহে রক্ষিত থাকবে।

এবং তাঁর রচনার প্রত্যেকটির সত্য এবং আবেগ দ্বারা আমি এখন যেমন, তেমনই আমার সচেতন কালঅবধি নিজেকে উদ্বুদ্ধ বোধ করব। আমার অপার সমবেদনা বন্ধুবর নজরুলের শারীরিক অসুস্থতার জন্য। তা না হলে তাঁর এখন সত্য এবং সাহসী রচনা-সংকলন এমন অনালোচিত থাকত না, তেমনই এই সাহসের দীপ থেকে আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যাঁরা যথার্থভাবে সাহসী এবং ঐকান্তিক তাঁরা তাঁদের যাত্রাপথকে আলোকিত করতে পারতেন।

বস্তুতঃ চব্বিশটি রচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 'সুন্দরের জন্য সংগ্রাম...'-এর বুকে। প্রত্যেকটি যে সমমাপের তা নয়। আমি এখনো পাঠ করতে পারিনি সব ক'টিকে। আমার হয়ত অনির্দিষ্ট সময় লাগবে। হয়ত পাঠ সমাপ্তই করতে পারব না। কেবল উচ্চারণ করব রচনার নাম এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য স্মরণ রাখব তার সত্যকে। নজরুলের 'বিস্ময়কর অথচ বিভ্রান্ত এক জাতি ও শেখ মুজিবুর রহমান নামক এক ধ্রুবতারা'। এই শিরোনামের রচনাটি শেষ করতে গিয়ে শেষ অনুচ্ছেদের গোড়াতে নজরুল লিখেছেন : "... কিন্তু সূর্য তো কিছুদিনের জন্য অস্ত যায়। অস্ত যাওয়া সাময়িক সময়ে আমরা আমাদের অর্জিত অমূল্য রত্নকে ক্রমশ হারাতে উদগ্রীব। তাই বলছিলাম, আমরা এক বিস্ময়কর জাতি হয়ে জন্ম নিলাম, কিন্তু আমাদের কোন অতলে নিয়ে যাচ্ছে।"...

রবীন্দ্রনাথের সেই দীর্ঘ কবিতাটি আমার হাতের কাছে নেই, যার নাম বোধ হয়; 'শিশুতীর্থ'। তাকে স্মৃতি থেকেও আমি উদ্ধার করতে পারব না। তার যে মর্মকথা আমার মনে গেঁথে আছে তার স্মৃতিটি এরূপ : মহাযাত্রায় যাত্রীরা : তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত অশক্ত, নারী পুরুষ, শিশু : তীর্থযাত্রীরা তাদের জীবনের কোন্ এক ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে এগুচ্ছে, এগুচ্ছে এগুচ্ছে। দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ। কত তার খাদ, খন্দ। পথ আর ফুরোয় না। পথ আর ফুরোয় না। যাত্রীদের জিজ্ঞাসা : আর কতদূর। আর কতকাল। তবে কি যাত্রীদলের পথপ্রদর্শক ভুল পথে পরিচালিত করেছেন যাত্রীদের? অসম্ভব কি? না হলে পথ কেন ফুরোয় না। সূর্য কেন ওঠে না? মানুষ ক্ষুদ্র প্রাণী। সহজ পথের সন্ধানী। বিশ্বাসে ভঙ্গুর। কত সাথী তো ইতিমধ্যে পড়ে গেছে। বিধ্বস্ত হয়েছে। অবিশ্বাস আর অস্থিরতায় উদভ্রান্ত হয়ে উঠল যাত্রীদল। রব উঠল : মার মার। হত্যা কর পথপ্রদর্শককে। ও আমাদের ঠকিয়েছে। ভুল পথে এনেছে। মার মার ওকে। হত্যা কর। উদভ্রান্তরা জানে হত্যা করার মতো সহজ কাজ আর নেই। তাই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের পথপ্রদর্শকের ওপর। তাকে দলিত মথিত করে হত্যা করল।... কিন্তু সূর্য আর ওঠে না। অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর হয়। আর্তনাদ ওঠে : এখন কি উপায়? কোথায় যাব আমরা? কোথায় যাচ্ছি? এখন কে আমাদের পথ দেখাবে?...

যেন অন্তরীক্ষ থেকে উচ্চারিত হয় এই বাণী : সেইই আমাদের পথ দেখাবে, যাকে আমরা হত্যা করেছি।...

স্নেহভাজন আনিসের (অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের) ভূমিকাটি সত্য এবং সুন্দর। আমিও বলি আমার অচেনা প্রিয়বর নজরুল যেন তৈরী করেছেন তাঁর জীবন দিয়ে, জীবন-সত্যের একটি দলিল। এ দলিল নতুন প্রজন্মকে এই মহানিশার মধ্যে পাঠ করতে হবে এবং এর সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হবে। এ বোধে অস্থিরতার কোন স্থান নেই। এর কোন বিকল্প নেই।

'সুন্দরের সংগ্রাম ও বুদ্ধিবাদের ট্রাজেডি'র লেখক মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে আমার আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি, অভিনন্দন। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

১২.০৯.২০০২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি দিনের পদ্য

আজ সারাটা দিন বড় মজায় কেটেছে। তাতে যেমন মনে আনন্দ পেয়েছি, তেমনি মাথার উপর যে একটু চাপ পড়েছে, তাও ঠিক। সকালে ফোনের মধ্যে প্রিয় মুজাফফরের ধমক শুনলাম মন ভরে (ন্যাপের প্রফেসর মুজাফফর)। সৌভিককে (সৌভিক রেজা) পাঠিয়েছিলাম ওর মন মেজাজ বুঝতে। সৌভিক ওঁকে আমার একটা ফোনের নম্বরও দিয়ে এসেছিল। ভেবেছিলাম সৌভিককে নিয়ে ওঁর রাজমনির কাছের বাড়িতে যাব। কিন্তু আজ ও নিজেই ফোন করে ওঁর নিজের চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে : ওঁর সমাজের চরিত্র ধরতে পারার ক্ষমতা, কাউকে পরোয়া না করার ভঙ্গী এবং বক্র কথকের দক্ষতা নিয়ে টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে সেই প্রায় বিশ বছর আগের অবয়বেই ভেসে উঠল। একেবারে সাক্ষাতভাবে। গলার স্বরে, ধমকের বাহাদুরীতে কোথাও যেন এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। আমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল। নিজেই আমার বোধের উদ্ধৃতি দিয়ে বলল : সরদার তুমি কম কঠিন মানুষ নও, দেখতে ছোটখাটো হলে কি হবে। তোমার কথাই ঠিক : 'এ ম্যান হু ক্যানট বি এ গুড ফাদার টু হিজ ফ্যামিলি, ক্যানট বি এ গুড কমিউনিস্ট'। আমাদের দু'জনার সম্পর্কই পরস্পর 'তুমি'র সম্পর্ক। আমি আশ্চর্য হলাম মুজাফফরের উদারতায়। মুজাফফর মুজাফফরই। অপরিবর্তিত। এটা কম আত্মশক্তির পরিচয় নয়।

আমার লুৎফুল করিমও অপরিবর্তিত। আমাদের চাইতে হয়ত বয়সে একটু বড়। তবু ঢাকা কলেজে আইএ ক্লাসের একান্ত অন্তরঙ্গ সহপাঠী। বাংলাদেশের উনিশ থেকে বিশের মধ্যভাগের অন্যতম শিক্ষিত পরিবারের লুৎফুল করিম। আমার অগ্রজপ্রতিম নাজমুল করিমের ছোটভাই। বজলুল করিম সাহেব তথা 'একে বিকে', শামসুল করিম, সাজেদুল করিম, লুৎফুল করিম। এদিয়ে একটি উদ্দীপনাময় উপন্যাস তৈরি করা যায়। নাজমুল করিমের 'ফালগুন করা'র মধ্যে রয়েছে তারই প্রকাশ। লুৎফুল করিম নিজেই আমার বাসা খোঁজ করে আসে। আজও এল। হাতে কিছু থাকবেই। হয় মিষ্টি, নয় ফল। আজও লিচু নিয়ে এসেছে। ও নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়। কিন্তু নিজে এক দুরন্ত বৈজ্ঞানিক। আজ এসেছিল ওর বৈজ্ঞানিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণামূলক চিন্তার ইংরেজীতে লিখিত প্রকাশ নিয়ে। ও ওর চিন্তার নাম দিয়েছে : 'এক্সপ্যান্ডিং ফোর্স অব দি ইউনিভার্স ইজ দি অরিজিন অব লাইফ্ ফোর্স'।

পরে এল সৌভিকটা (সৌভিক রেজা) তার বন্ধু মহিউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে। শিল্প ব্যাংকের ম্যাজেনার কেবল নন, গুণী ইঞ্জিনিয়ারও। দেখলে ভেতরের গুণকে বোঝার উপায় নেই। অথচ হীরক। সৌভিককে বাসায় বসাতে সাহস পেলাম না। বললাম, চলো আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ি! তাই করলাম।

ওরা দু'জনে নিয়ে বসাল আমাকে শেরাটনের পানিভরতি পাকা চৌবাচ্চার পাড়ে।

বসার পরে, একটি তরুণী, বুকের প্লেটে নাম লেখা 'তেরেসা' কিন্তু বাঙালী। এসে আমাকে অবাক করে সালাম দিয়ে বললেন : স্যার আমার কি সৌভাগ্য, কতদিন পরে আপনাকে পেলাম!

সৌভিক তাঁর মনের কথা অবাধে মধুর হাসি আর শিশুর বিস্ময়ের সঙ্গে প্রকাশ করে চলল সারাক্ষণ। বাসায় যখন এসেছিল, তখন আমার বাসার কর্ত্রীর ধমকের ভয়কে উপেক্ষা করে আজও গুরুদক্ষিণা নিয়ে আসতে কসুর করেনি। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল বিকেল চারটায়।

আমি যে কেমন করে ওদের সঙ্গে এতটা সময় কাটাতে পারলাম, তা ভেবেই বাসায় ফিরে আশ্চর্য বোধ করলাম।

তার পরে এলো আমার কর্ত্রী যাকে ভয় করে, এলো সেই এলোমেলো মাথাভরতি চুল আর মনভরতি জ্ঞান আর বিস্ময় নিয়ে চট্টগ্রামের সেলিম। আমি বলি জ্ঞানপাগল সেলিম। কোন ব্যাংক অফিসার। আমার জীবনের সব কাহিনী আর বিশ্বাসকে এই যুবক আমার চাইতে বেশি জানে। এ আমার স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। আর ভেতরে কি দরদী মন। আজ যে কাহিনী বলল তাতে আবেগময় আমার চোখে পানি না জমে পারল না। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

এক নির্দোষ ফাঁসির আসামী। ওরই প্রতিবেশী। ফাঁসির দড়ির অপেক্ষায় ফাঁসির আসামীর তথা 'কনডেমন্ড' সেলে হাহাকারভরা মন নিয়ে দিন গুনছে, কবে ওর ফাঁসি হবে।

সেলিম অবিশ্বাস্য চেষ্টা করে; কারাগার প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের কাছে গিয়ে আত্মীয় না হয়েও সেই মৃত্যুর অপেক্ষমাণ আসামীটির সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছে। যে-সময়টুকুর অনুমতি পেয়েছিল, কারাগারের জালের এপার থেকে সেই মানুষটিকে সে দেখেছিল আর কেবল বলছিল! আমি জানি, আপনি দোষী নন। কিন্তু আমি কত অসহায়। আমি আপনাকে বাঁচাতে পারছি না। তবু আপনি বলুন, আপনার মনের কথা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিম বলল : কিন্তু সারাটা সময় সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটি বাক্যও উচ্চারণ করল না। নিরুপায় হয়ে আমি যখন চলে আসার উপক্রম করছি, তখন সে আমাকে জালের ওপার থেকে চোখের ইশারায় আকর্ষণ করলো আর অস্ফুটে বলল : 'আমি জানব আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার কাছে একটি মানুষ এই কারাগারে এসেছিল : আর সে মানুষ আপনি।'

আমি এ কাহিনী শুনতে শুনতে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার চোখের কোণে পানি জমছিল। সেলিম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল : 'আপনি কাঁদছেন!'

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বললাম : আমি আবেগের মানুষ। আমি পারিনে নিজের কান্নাকে রোধ করতে। তুমিও আজ আমার কাছে অদ্ভুত এক যুবক বলে দেখা দিলে। তুমি কেন এ কাহিনী লিখছ না। যদি আমাকে ভালবাস তবে এই কাহিনী যেমন করে পার, তেমনি করেই লিখে আমাকে দেখাতে হবে।

এটা আমার আন্তরিক প্রকাশ ছিল। আজও ওর নতুন সংগৃহীত এক বইয়ের কথা বলল। আমি বললাম, তুমি জ্ঞানের সাগর। আমার কাছে আসতে সঙ্কোচ করো না। যখনি মন চায় এসো। ঘরে বসতে না পারি, দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবো, বলে ওকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। এই সময়েই মেয়ে স্বাতী এলো। সেলিম বলে উঠল : আমি আপনাকে চিনি। আপনি স্যারের মেয়ে স্বাতী, আফসানা করিম।

স্বাতী বিস্মিত হয়ে বলল : আপনি আমাকে কেমন করে চিনলেন!

দীর্ঘদেহী, উনকু-খুসকু চুলধারী সেলিম সুন্দর করে হাসল। বলল, হ্যাঁ আমি আপনাকে চিনি। আপনি সরদার ফজলুল করিমের মেয়ে।...

০৬.০৬.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের উপায় কী বল

কোথাও যাইনি, শুক্রবার। চেষ্টা করেছিলাম 'অনুপম প্রকাশনী'র মিলনকে ধরতে ফোনে; কিন্তু পেলাম না। তবে আনোয়ার কবিরের রাসায় ফোন করে কবিরকে ধরেছিলাম। কবির বলল, ওর অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছে। চারদিন হাসপাতালে ছিল। এখন ভালো হয়েছে, তবে সপ্তাহখানেক বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রথমে উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। পরে ভালো হয়েছে শুনে ভালো লাগল। ওকেও অনুপম প্রকাশনীর কথা বললাম। বেশি বললাম না। মাত্র অসুখ থেকে উঠেছে।

আজ বাসায় 'ভোরের কাগজ'টা পেয়ে ভোরের কাগজে প্রকাশিত দুটি লেখা পড়লাম। আজকাল ইন্টারনেটের কী একটা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে : কম্পিউটারের মাধ্যমে ইংরেজিতে বহু আগে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা বা বই 'ডাউনলোড' করে যার কম্পিউটার আছে সে তা পড়তে পারে। এমন তো ঘরে ঘরে কম্পিউটার। আর কাগজের অফিস ভরতি কম্পিউটার। প্রত্যেকের টেবিলেই একটা। একটা লেখার নাম দিয়েছে : 'জ্যাক দেরিদার সঙ্গে কর্তাবার্তা'। আজকালকার তরুণদের মুখে 'উত্তর আধুনিকতার' কথা শুনতে শুনতে আমার মতো মূর্খের মুখেও 'জ্যাক দেরিদা' এসে গেছেন। ভূমিকাতে পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে : 'ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন সারফুদ্দিন আহমেদ। আমি ভোরের কাগজের এক কোণে লিখে রাখলাম : সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আবার পাঠ করার জন্য তুলে রাখতে হবে।

এই সংখ্যার আর একটি লেখার নাম : 'মানুষের উপায় কী বল' লেখক বিপ্লব বালা। এঁর কোন লেখা আগে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। কিন্তু আজকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের তথা আমরা যারা বৃদ্ধ এবং যারা নতুন প্রজন্ম তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিপন্ন অবস্থার বিষয়ে। লেখাটির নানা জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছি। আজকালকার পত্রিকা একটি কৌশল বার করেছে, মুদ্রিত লেখার গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশকে বড়ো টাইপে, এমনকি রঙিন করে একটি 'বক্স'-এর মধ্যে মুদ্রণ করে। তাতে আমার বেশ একটি সুবিধা হয়। অণু অক্ষরে মুদ্রিত সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা পরতে না পারলেও 'বক্স'-এর মধ্যকার ছত্র কটি পড়ে লেখার মূল লক্ষ্যটি বুঝার চেষ্টা করি। সেই বক্সেরই একটি স্থানে আছে : 'দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকারও খুবই ক্ষমতাবান অবস্থা দেশে, সমাজে। বাজার আর পাঠকের মুখ চেয়ে তাদের ব্যবসা ও ক্ষমতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।'...

আমার দিনলিপির মধ্যে আর তুললাম না। সংখ্যাটিই তুলে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনখানে রাখব তা জানিনে। আর খোঁজ করে বার করতে পারব কিনা, তারও ঠিক নেই। 'ভোরের কাগজ'-এর বিষ্ণু, অনু হোসেন, হারুন– ওদেরকে বলতে হবে, এই লেখকের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে। লেখাটি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছা। কিন্তু একথা থাক। আমি বুঝতে পারছি না, ভোরের কাগজ যে বলেছিল তারা একটি বর্ষপূর্তি সংখ্যা বের করবে, সেটা কি বের করেছে। বের করলেও আমি পাইনি। আর করলেও আমার একটি সেমিনারের যে রিপোর্ট আমি দিয়েছিলাম, সেটির গতিক কী হয়েছে।...

আজ সন্ধ্যার পরে প্রথম সারপ্রাইজ দিল মশিউল : আমার এক প্রিয়পাত্র, যে আমাকে দেখলে পরেই 'কমরেড' বলে সম্বোধন করে। মশিউলের পেছনে দেখলাম লুনাও আছে। বুঝলাম ওরা আসার ব্যাপারে ঠিক করেই এসেছে। লুনার প্রশ্ন আর আলাপ বিরামহীন। তাতে আমার মতো বৃদ্ধের খই পাওয়া অচিন্তনীয়। কোথা থেকে কোথায় যে ও যায় এবং কত লোক ও ব্যক্তিত্বকে যে ও গভীরভাবে চেনে, তাদের ভাবভঙ্গী : সব, তাদের মুখের কথা এবং তাদের যোগ্যতার প্রকাশ ওর একেবারেই কণ্ঠস্থ। ও এখন 'ব্র্যাকে'র এক পরিচিত কর্মী। ব্র্যাকের সঙ্গে আমারই কেবল কোন পরিচয় নেই। কেবল ব্র্যাক নয়, বেসরকারি এবং বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানকে আমি যেমন চিনিনে, তেমনি তাদের কার্যক্রমকেও বুঝিনে। অবশ্য এরা সবাই গরিব মানুষের ভালো চায়। তার প্রগতি এবং অগ্রগতির যে সংখ্যাতথ্য ও দেয় তাতে চমকিত না হয়ে পারা যায় না। আসলে ওরাই ঠিক। বুড়িগঙ্গা নদী কিংবা ব্যক্তি এরা কেউই থেমে নেই। আমার মতো বৃদ্ধ নয়। এবং তার পরিবর্তনের যে নানাভাবে প্রকাশ না ঘটছে এমনও নয়। আর এখন সেই পরিবর্তনের প্রকাশ হচ্ছে কূলপ্লাবী বন্যায়। ওদের সংখ্যাতথ্যে তার পরিমাণ ও প্রমাণ নানা কাগজে এবং টিভির পর্দায় দেখা যায়।

মশিউল আর লুনা যাওয়ার আগেই অনেকদিন পরে বুলবুলি মেয়েটি এসেছিল। অনেকদিন যাবৎ আসেনি বলে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই চিন্তিত হচ্ছিলাম। আজ এসে কিছু খবর দিল। তার একটা হচ্ছে ও একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে কাজ করছে। নিজের ইংরেজি এমএটা এখনো শেষ করেনি। তবে করবে। ওর নানা দিকে দৃষ্টি। আজ বলল, ও ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর একটু চিন্তা করছে। এর ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করতে চায়। এখন ধরেছে 'বাইবেলকে'। কারণ বাইবেল তো কেবল ধর্মীয় পুস্তক নয়। বাইবেল তো ইতিহাসও বটে। মেয়েটার এসব কথা এবং জিজ্ঞাসা আমার বেশ ভালো লাগে। এদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের বিকাশের একটা পরিচয় লাভ করা যায়। আমি পঙ্গু মানুষ। কোথাও গিয়ে, এমনকি কোন গ্রন্থাগারে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের ওপর বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটিও করতে পারিনে। আজকের একটি ভালো খবর। বৃষ্টি হয়নি। শুকনো দিন ছিল। হয়তো এতে বন্যার প্রকোপ কোথাও কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, বা পাচ্ছে। কিন্তু পাশের ঘরের টিভির শব্দ বলছে, বন্যার অবস্থা এখনও ভয়াবহ।...

ঘুমাতে যাব। রাত বারোটা, এমন সময় মগবাজার থেকে আমার স্নেহের ধন পৌত্র রবি ফোন করেছিল। ভয় পেয়েছিলাম পানির কথা ভেবে। কিন্তু রবি কোন ভয়ের কথা বলেনি। পানি বাড়ছে, তবু এখনও ঘরে ওঠার সিঁড়ির নিচে। রবি কথাও বলেছে সুন্দর করে। আমাকেই সে বলল : চিন্তা করো না। আমরা, ইট, বালু আর সিমেন্ট জোগাড় করেছি। বাঁধ দেবো। রবির বয়স এখন সাত পেরিয়ে আট। ওর এমন কথায় মন ভরে গেল। তবু আমি তো জানি বন্যা কাকে বলে।

রাজশাহী থেকে সৌভিক রেজাটা ফোন করেছিল। খুব ভালো লাগল। আমার নতুন 'নানা কথাটাকে' ও জোগাড় করেছে। যার মধ্যে 'পোর্ট্রেট' লেখাটার খুব প্রশংসা করল। বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝে কোন কথার কী অর্থ।

AMARBOI.COM

২৩.০৭.২০০৪

প্যাপিরাস থেকে 'ভোরের কাগজে' ফোন করে হারুনের সঙ্গে কথা হলো। তাদের বর্ষপূর্তি সংখ্যা বেরুবে ২৮ জুলাই তারিখে। আমাকে আমার দিনলিপি দিতে বলল।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সোনালী ব্যাংকের শাখা থেকে কিছু টাকা জোগাড় করতে সেখানে যেতে হয়েছিল। একটা 'সিএনজি' পেয়েছিলাম। সে একটি গলি দিয়ে পান্থপথে ওঠার চেষ্টা করতেই দেখল বেশ পরিমাণ জায়গা পানিতে ডুবে গেছে। অথচ গলির এ সড়ক গতকালও শুকনা ছিল। আজ লোকজনকে এই জায়গা হতে রিকশাকে নৌকো করে ভাড়া দিয়ে পার হতে হচ্ছে। আজ আর ব্যাংকেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিনি। টাকার জন্য দিলীপের ঘরে যেতেই সে বলল : তার গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনও ঢাকায় তার বাসায় এসে উঠেছে। তার এখানের বাসার নিচের তলা ডুবে গেছে। অক্ষম এক আত্মীয়কে কোলে করে দোতলাতে উঠাতে হয়েছে।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্যার কথা যদি বলি তবে বলব আমরা পশ্চিম রাজাবাজারে, ইন্দিরা রোডের যে অবস্থানে আছি সেখানে দুদিন পরে হলেও উত্তর-পূর্ব দিকের উঁচু এলাকা থেকে পানির ঢল এখানেও নামবে। প্রতিবছর এমনি করে নামে। এবং প্রতিবছরের বন্যা আগের বছরের চেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

আমার সাংসারিক জীবনে বহু বছর আগে থেকে ঢাকার বন্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। এখন এই জুন-জুলাই এলেই বন্যার আতঙ্কে মন কেঁপে ওঠে। ১৯৮৮ সালের বন্যা আমি দেখেছি। তখনো আমার অসমাপ্ত বাসাটির দেয়ালে একবার দাগ কেটেছি, দিনদিন পানি কতখানি বাড়ল, তা দেখার জন্য। বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য বাঁশের 'চার' বেঁধেছি। পরিবারের আর সকলকে অপর আত্মীয়স্বজনের বাসায় রেখে নিজে একা বাসায় থেকে পানির দাগের ওঠানামা দেখেছি আর বাসা পাহারা দিয়েছি। হয়তো দু'সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি সময় পরে পানিতে টান ধরেছিল। তখনো দেয়ালের সেই দাগ, যার কোনটাতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোনো জায়গার ছবি যেন ভেসে উঠত। কোন জায়গায় অন্য কোন দেশের প্রতিকৃতি। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও বন্যার পরে স্মৃতিচারণ করেছি। এমন একটি স্মৃতিচারণের সংকলনের নাম দিয়েছিলাম 'নূহের কিশতি'। সেই পুরাণের কাহিনী। সমস্ত পৃথিবী পানিতে ডুবে গিয়েছিল। মানুষসহ সমস্ত প্রাণিকুল। নূহ (আঃ) একটি বড়ো বজরা তৈরি করেছিলেন। আর তাতে সমগ্র প্রাণিকুলের একটি করে জোড়া রক্ষা করেছিলেন। আর তাই বন্যার শেষে প্রাণিকুল তীরের সাক্ষাৎ পেয়ে আবার জীবন শুরু করার চেষ্টা করেছে।

নূহের কিশতির সেই প্রাণিকুলেরই জীবিত প্রজন্ম আমরা। ১৯৯৮ সালের বন্যাও তেমনি। এবার আর দশ বছরের ব্যবধান নয়; '৯৮ থেকে ৬ বছরের ব্যবধান : ২০০৪। একদিক দিয়ে দেখলে এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ মূর্খ মানুষের উপর। এক সময়ে বালখিল্যের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে গর্ব করতাম : মানুষই হবে প্রকৃতির প্রভু; প্রকৃতি মানুষের ওপর নয়। অথচ আসল সত্যটা হচ্ছে : মানুষও প্রকৃতির : তথা খাল, বিল, নদী, গাছগাছড়া, পশুপাখি : সরারই সহাবস্থানের ব্যাপার। মানুষ তথাকথিত রাষ্ট্র করে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। লক্ষ হাজার মানুষ মারে, গাছগাছড়া গোড়া কেটে সাবাড় করে, খালবিল ভরাট করে। নতুন করে খাল কাটে না। ওপর থেকে পানির ঢল নামে। খালবিলের গভীরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়, গভীর খাল, নদীও বালুতে ভরতি হয়ে যায়, বিরাট বিরাট নদীতেও চর জাগে। এককালে যেখানে স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ বিনা বাধায়, অবাদ গতিতে ঢেউ তুলে যাতায়াত করতে পারতো, সেখানে এখন যেমন বন্যায়, তেমন খরায় নদ-নদীর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের কর্তাদের কর্তাগিরি করা ছাড়া আর যেন কিছু করার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের বিরাট মাঠ : জাতীয় ঈদগাহ : ঈদের জামাত হয়। এই মাঠ '৪২-৪৪ সালেও ছিল বেশ বড়ো একটি জলাশয় : হ্রদের মতো। তখন ঢাকা হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ-মার্কিনের সামরিক ঘাঁটি। ব্রিটিশ-আমেরিকার সাদাকালো মানুষগুলো আমাদের মানুষ বলে গণ্য করত না। উলঙ্গ হয়ে হ্রদ-প্রায় এই জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। বর্তমানে যে হাউস বিল্ডিং করপোরেশনের বহুতল ভবন, তাও গড়ে উঠেছে একটি পুকুর ভরাট করে। নওয়াবপুর-রায়সাহেব বাজার পয়েন্টে যে সেতুর আভাস পাওয়া যায় তার নিচ দিয়ে বইত বেশ পরিসরের এক খাল। এই খাল লোহারপুল থেকে শুরু করে নয়াবাজার হয়ে মিটফোর্ডের পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পড়ত।

আসলে মানুষ, মানুষ নয়। প্রকৃতি আর তার সব লতাপাতা, গাছগাছালির সবচেয়ে বড়ো শত্রু হচ্ছে মানুষ নামক দ্বিপদ এক জন্তু, যে কেবল জানে নানা যন্ত্রপাতি আর মারণাস্ত্র তৈরি করতে। এই মূর্খ দ্বিপদ জন্তু কেবল এটি বুঝে না, ওদের নিজেদের কর্মকাণ্ড হচ্ছে ওদের, তথা সব মানুষের এবং মানুষেরই সৃষ্ট সভ্যতার ধ্বংসমূলক, আত্মহত্যামূলক কর্মকাণ্ড। তাই বলছিলাম এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ।...

তাই আশাবাদের সব কথা বাদ দিয়ে আজ বলতে হয় : আমাদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে অন্ধকার, ধ্বংস আর আত্মহত্যার ভবিষ্যৎ : এবং মানুষ হিসেবে পুরো নিশ্চিহ্ন হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ।

এখনো সময় আছে সকল তথাকথিত : এ জাতি, সে জাতি, এ রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রের মানুষের বুঝার যে, সবার সঙ্গে সবার, সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুর সহাবস্থানের প্রয়োজনের উপলব্ধি। সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুর সহাবস্থানের বাইরে আর কোন সত্য নেই।...

২৪.০৭.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকা বনাম মুসলিম বিশ্ব

এ শিরোনাম আমার নয়। বিশ্লেষক, চিন্তাবিদ, লেখক হোসেনুর রহমানের। কয়েক মাস আগের রচনা। কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান থেকে ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এই শিরোনামের লেখাটি গত ১৮ জুলাই, ২০০৪ তারিখে।

লেখাটি আমি একবার পড়েছি। মাঝে মাঝে তার বিভিন্ন স্থান তারকা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করেছি। মনের ইচ্ছা, কাগজটি কখন কোথায় হারিয়ে যায়, ঠিক নাই। তবু তার মর্মকথা যদি একটু ধরে রাখতে পারি।

হোসেনুর রহমান সাহেব তাঁর মূল রচনার আর একটি সাব-শিরোনাম দিয়েছিলেন : 'মুসলমানদের অন্তঃপ্রকৃতি থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের' পরিচয় মিলছে।

আমি সাধারণত ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সাহস দেখাইনে। আমার বুঝা সহজ বুঝ। মানুষের সমাজ হচ্ছে মানুষের বাগান : মানুষ মাত্রই একটি ফুল : সে ক্ষুদ্র হোক, কিংবা দীর্ঘ হোক, সে সাদা হোক কিংবা কালো হোক, তার নাক, চোখ, মুখের মধ্যে যতো বৈচিত্র্য থাকে তবেই সে বিভিন্ন প্রকার ফুলের সম্মেলনে একটি মনুষ্য-ফুলের বাগানে পরিণত হয়। পাখ-পাখালির মধ্যেও তাই। ওদের মধ্যে তেমন বৈচিত্র্য যদি বিরোধ না ঘটাতে পারে, তবে মানুষের বাগানে মানুষের বৈচিত্র্য মানুষের মধ্যে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, মারামারি, কাটাকাটি কেন ঘটবে?

কেন ঘটবে সেই প্রশ্নটিই বর্তমানের মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধের তথা আত্মহত্যামূলক পরিস্থিতির সবচাইতে বড়ো প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের যদি আমরা মোকাবিলা করতে না পারি, তবে মানুষ জাতি হিসেবে, সমগ্র মনুষ্যকুলই : কালো, সাদা, সিধানাক, বোচানাক : সবকিছুই, সব মানুষেরই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমন একটি উক্তি মার্কসের কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর মধ্যেই রয়েছে : 'আজ পর্যন্ত যতো সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।'

'স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লেবিয়ান, জমিদার এবং ভূমিদাস, গিলডকর্তা আর কারিগর : এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী : সর্বদাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনো আড়ালে, কখনো বা প্রকাশ্যে : প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।'

এই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য অর্থগত এবং বস্তুগতভাবে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

এই মহাসত্যের এক চূড়ান্ত পর্যায় চলছে বর্তমান সময়ে সমগ্র মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সে মার্কিন সরকার ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এর মূল হচ্ছে যুদ্ধযজ্ঞের মূল ঘাঁটি আমেরিকার পেন্টাগন নামক সংস্থা। এই 'পেন্টাগন' শব্দটিকে যে কোনো বিশ্বকোষে যে কেউ অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন। এই পেন্টাগনের বশংবদই হচ্ছে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের সরকার : সে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট যাই হোক না কেন।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং লেখক হোসেনুর রহমান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে দ্বন্দ্ব চলছে তার মূলসূত্রটি তিনি উদঘাটন করে দেখিয়েছেন।

মার্কিন সরকার, তথা ফ্রাংকেনস্টাইন বুশের পরিচালিত যুদ্ধের একটা দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন আমেরিকা ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং যেন মুসলিম বা ইসলামি বিশ্ব বলতে যা বুঝায়, সেই ইসলামি বিশ্ব মার্কিন সরকারের বিরোধী এবং মূল সংগ্রামী।

AMARBOI.COM

হোসেনুর রহমান সাহেব তাঁর আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদেই বলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এবং বিশ্ব ইসলাম কি তাদের সংঘাতকে ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেডে পরিণত করতে চলেছে, না তারা এখনো পারস্পরিক সুসম্পর্কের পথ প্রশস্ত করার কথা ভাববে? পরেরটাই বিশ্ব-শান্তির পক্ষে, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। আর এ কাজ করতে হলে উভয়পক্ষকে যুক্তি, শান্তি, সম্প্রীতি এবং আত্মসমালোচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হতে হবে। মার্কিন সরকারকে বুঝতে হবে, কেবল স্বকর্তৃত্ব অপরিহার্য করে তোলাটাই আসলে মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র বিস্তার করার সহায়ক নয়। ৯/১১-এর পর বিশ্ব শান্তির গোটা পটভূমিকাটাই বদলে গেছে। যুদ্ধ অদৃশ্য যুদ্ধে পরিণত হয়েছে; ৯/১১-এর পূর্ববর্তী পৃথিবীতে সন্ত্রাস ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল। সমস্ত ক্ষেত্রেই আত্মপক্ষ সমর্থন করার যুক্তি ছিল। কিন্তু ৯/১১-এর নতুন বাস্তবতা হিংসার গণতন্ত্রীকরণ বিশ্বজনীন করলো।

হোসেনুর রহমান সাহেবের এই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে তিনি বলেছেন : 'সদ্যপ্রয়াত এডওয়ার্ড সাইদ এই মর্মে স্পষ্ট করে বলেছিলেন : T. G. Preaches one thing, does, another, এডওয়ার্ড সাইদ মুসলমান ছিলেন না।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেনুর রহমান সাহেবকে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার আমার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই। আমি বলবো : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে যে দেশ এবং সরকার পৃথিবীর আপামর মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠছে যুদ্ধবাজ হিসেবে তার মূল ৯/১১তে নয় ৯/১১-এর ঘটনার কোন তদন্ত হয়নি এবং হবে না। কারণ ৯/১১-এর আসল হোতা হচ্ছে আমেরিকার পেন্টাগন। আর সেই পেন্টাগনের বশ্য এবং দাস হয়ে এসেছে আধুনিক যুগের সর্ব সময়ে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মানুষের সমাজকে নির্যাতনমুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে যেদিন ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক একট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলো সেদিন, সেদিন থেকে।

মার্কিন পুঁজিবাদকে আমরা কেউ শুক্তিহীন যেমন মনে করিনে, তেমনি এর কোন সরকারই সেই ১৯১৭ সাল থেকে সমাজতন্ত্রকেই যে তার মূল শত্রু বাদে অপর কিছু ভাবতে পারেনি, সে কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

আজ কোথাও কার্থেজ নগরীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ইটালি তথা রোমান সাম্রাজ্যের অদূরে নাকি ছিল কার্থেজ। আর রোমান সম্রাটদের দিন-রাত্রির স্লোগান ছিল : কার্থেজ মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড : কার্থেজকে ধ্বংস করতে হবে।

সমাজতন্ত্রের ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন সরকারের রাত-দিনের স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে : সোশ্যালিজম তথা সমাজতন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। আমি বলি ঊনবিংশ শতকের ফরাসি শ্রমিক কমিউনের তথা প্যারিকমিউনের পরবর্তীতে দ্বিতীয় 'প্যারিকমিউন' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া : ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস।

তখন থেকে পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মূলশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিন-রাত্রির ধ্যান-জ্ঞানের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের সমাজের নির্যাতন মুক্তির একমাত্র শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাকে ধ্বংস করতে হবে। এবং মার্কিন পুঁজিবাদ সঠিকভাবেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার নিজের মৃত্যুর প্রাণ-ভোমরা বলে চিহ্নিত করে। এবং তখন থেকে সশস্ত্র আক্রমণ করা থেকে আরম্ভ করে অন্তর্ঘাতমূলক সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী শক্তিরা গ্রহণ করতে থাকে। পরিণামে ক্রুশ্চেভ থেকে গরবাচেভ প্রভৃতি তথাকথিত নবায়নের নামে সমাজতন্ত্রের শত্রু ভেতর থেকে আক্রমণ করতে থাকে। এই আক্রমণই ১৯৯০-তে রুশ ইয়েলৎসিনের শিখণ্ডী চরিত্রে প্রকাশিত হয় এবং সোভিয়েট সরকারের পতন ঘটে। তারপরের ঘটনা আমরা সবাই জানি।

বর্তমান পর্যায়ে যে যুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী সংঘটিত হচ্ছে, তার মূল নেতা যেমন ফ্রাংকেনস্টাইন চরিত্রের মার্কিন সরকার, বুশের সরকার, তেমনি তার বিপক্ষে কেবল যে ধর্ম হিসেবে মুসলমান ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র, তাই নয়। ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতিত সকল মানুষই হচ্ছে মার্কিন হত্যাযজ্ঞের মূল লক্ষ্য। আর তাই ৯/১১-এর আগের এবং পরের এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল তথা বিভক্তির লাইন।

৯/১১ পেন্টাগনের কীর্তি। সে সত্য ক্রমান্বয়েই প্রকাশিত হচ্ছে। তাই আমি বলবো : হোসেনুর রহমান সাহেবের রচনার মূল শিরোনাম হওয়া প্রয়োজন আমেরিকা বনাম মানব সভ্যতা।

একদিকে মানব সভ্যতা রক্ষার চেষ্টা আর সেই যুদ্ধে সকল দেশের, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নির্যাতিত মানুষের সংগ্রাম। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের প্রয়োজন। এখানে এ-ধর্ম এবং ও-ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, কোন লাভ নেই। তেমন বোধের ফলে লাভবান হবে কেবলমাত্র মনুষ্য সভ্যতা ধ্বংসকারী মার্কিন সমরকেন্দ্র পেন্টাগনের ব্লুপ্রিন্ট এবং তাকে দুনিয়াব্যাপী কার্যকর করার মার্কিন শত-সহস্র বাহুর এক অক্টোপাস।

১৪.০৯.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও মৃত্যুরই মরণ ঘটবে

আজকের 'ভোরের কাগজে' প্রকাশিত প্রীতি ও স্নেহভাজন মুনতাসীর মামুনের গভীর আবেগপূর্ণ লেখাটি পড়েছি। দুই মানুষের আবেগ এবং ভাবের অভিন্নতা বলে যদি কোন কথা থাকে তবে মামুনের আবেগ এবং ভাবের সঙ্গে আজ এই মুহূর্তের আমার আবেগ এবং ভাব অভিন্ন। মামুনের সঙ্গে অনেকদিন যাবৎ দেখাসাক্ষাত হয় না। ওর টেলিফোন নম্বরও জানিনে। জানা থাকলে সেই ফোনে ওকে বলতাম : মামুন তোমার আবেগ ও ভাব আমারও আবেগ ও ভাব অভিন্ন। কিন্তু তোমার মত প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি তোমার জীবনে বিস্ময়কর নানা পর্যায় অতিক্রম করেছ, নানা নির্যাতন ভোগ করেছ। তোমার এমন ক্রম উত্তরণে আমি বিস্ময়বোধ করেছি।

তোমার আজকের লেখার শিরোনাম দিয়েছ : 'কেন এ দেশে জন্মেছিলাম!' এ জিজ্ঞাসা যে তোমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে কেন এভাবে বেরিয়ে এসেছে, তাও আমি বুঝি।

AMARBOI.COM

কেবল আমি নই, যারা রোজ এই দেশে নিহত হচ্ছেন এবং এ যাবৎ হয়েছেন, তাদেরও জিজ্ঞাসা : কেন এই দেশে জন্মেছিলাম?

তুমি যদি কাছে থাকতে, তাহলে আমি তোমার হাতে হাত রেখে বলতাম : তুমি, আমি কেউ আমাদের চেতনার উন্মেষকালে এমন দেশের স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্ন দেখেছি : মানুষ মানুষের ভাই, মানুষ মানুষের হত্যাকারী নয়। এই বোধ নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত জীবন ধারণ করে এসেছি।

সেই স্বপ্ন ভাঙার আজকের এই চরম দিনেও আমাদের : তোমাকে আমাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে : তবুও আমি বলবো না : এ দেশ তোমার, আমার নয়। তুমি আমি দুজনেই আমাদের মা-বাবার কাছে অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী যে, তাঁরা আমাদের জীবন দিয়েছিলেন বলে। তাঁরা জীবন দিয়েছিলেন বলেই না অবিশ্বাস্য সব দুর্যোগ এবং দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে আজ আমরা অনন্ত সময়ের এই মুহূর্তে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছতে পেরেছি। এবং তাঁদের জীবনের ঋণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে আজো আমরা বলবো : আমাদের মৃত্যু আজ, কাল বা পরশু ঘটুক না কেন, আমাদের স্বপ্নের মৃত্যু কোনদিন ঘটবে না। মানুষ মানুষকে আত্মার আত্মীয় বলে গণ্য করবে। জীবনের মৃত্যু বলে কোন কথা নয়। কথা আছে 'মৃত্যুর মৃত্যু'। আর তার বিপরীত কথা হচ্ছে 'জীবনের জীবন'। জীবন বনাম মৃত্যুতে, মৃত্যুই মরে এবং জীবনই বাঁচে। আমি ব্যক্তি হিসেবে অবশ্যই মরবো; কাল, নয়তো পরশু : তবুও তোমার আমার মৃত্যুহীন স্বপ্নের কোন মৃত্যু ঘটবে না।

আসলে জীবন বনাম মৃত্যুতে, জীবনই বাঁচে এবং মৃত্যুই মরে। এ সত্যের কোন ব্যত্যয় নেই। কোন ব্যত্যয় কল্পনা করা যায় না। মুনতাসীর মামুনের লেখাটি তুলে রাখতে হবে।

মামুনের উদ্দেশে তারই শিরোনাম : 'এ দেশে কেন জন্মেছিলাম?' এই শিরোনাম দিয়ে ২ অক্টোবর তারিখে আমি একটি দিনলিপি তৈরি করেছিলাম। সে দিনলিপি গতকাল পর্যন্ত 'ভোরের কাগজে' পাঠাইনি। কিন্তু আজ ১০ অক্টোবর তারিখে 'জনকণ্ঠে' প্রথম পৃষ্ঠায় : 'বক্স' করা একটি খবর দেখে বুঝতে পারছিনে : আমি কি করি? কি করবো?

যে খবরটা বক্স করা হয়েছে তাতে এক ডাকাতের গণপিটুনিতে হত্যা এবং লেকের পানিতে ডুবে একটি কলেজের ছেলের অপমৃত্যুর খবর আছে। তার জন্যও আমার মনে আফসোস জাগছে।

কিন্তু 'জনকণ্ঠের' বক্সের খবরটিতে আমি যেন আমার নিজের আত্মহত্যাকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। দৃষ্টি আকর্ষণীয় বড়ো টাইপে মুদ্রিত খবরটি হচ্ছে : 'বাউল শিল্পীর পাঁচ বছরের মেয়েকে ধর্ষণের পরে হত্যা'।

এই ঘটনার একটু বিস্তারিত বিবরণ যা লেখা হয়েছে, তাতে এরূপ লেখা হয়েছে : শ্যামপুরের জিয়া সরণি এলাকায় বাউল শিল্পীর মেয়েকে ধর্ষণের পর জবাই করে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত শিশুকন্যার নাম আঁখি বেগম, বয়স পাঁচ বছর। শনিবার সকালে পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙ্গে আঁখির লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার আঁখির মা শিল্পী বেগম (৩৫) বাউল গানের আসরে রিকালে রাসা থেকে চলে যায়। তার স্বামী শফিকুল ইসলাম গুলিস্তানের ফুটপাতে ভাত বিক্রির ব্যবসা করে। বাসায় ছিল আঁখি ও তার বড়ো ভাই সজীব (৭)। রাতে তারা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা জিঞ্জিরা থেকে বাউল গান গেয়ে বাসায় ফেরেন। তিনি সজীবকে আঁখি কোথায় বললে, সে বলে শরীফদের বাসায় গেছে। অনেকক্ষণ পরে আঁখি ফিরে না আসলে তার বাবা নিজেই ঐ বাসায় গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেন বাসায় তালা ঝুলছে। তিনি কৌতূহলবশত জানালা দিয়ে উঁকি দিলে মেয়ের রক্তাক্ত লাশ দেখে চিৎকার করে উঠেন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তারা ঘরের দরজা ভেঙে আঁখির জবাই করা লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, আঁখিকে বঁটি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় আঁখির বাবা বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। নৃশংস এই খুনের ঘটনায় ঐ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আঁখিদের বাসা ১৬৩৬ জিয়া সরণি, গ্যাস পাইপ রোড এলাকায় বলে জানা গেছে।

মুনতাসীর মামুনের লেখাটি পাঠ করার পরে ভেবেছিলাম ওর দেওয়া শিরোনামেই আমি আর একটি দিনলিপি লিখি। লিখেও ছিলাম। আর সে দিনলিপির শেষে বলেছিলাম : জীবন বনাম মৃত্যুর লড়াইতে জীবনই বাঁচে, মৃত্যুই মরে। এ সত্যের কোন ব্যত্যয় নেই। কোন ব্যত্যয় কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আজ 'জনকণ্ঠে' পাঁচ বছরের শিশু কন্যার ধর্ষণ এবং জবাই করার যে ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা পাঠ করে আমার আজকের এই বেদনার্ত লেখাটুকুর কি শিরোনাম দেবো ভেবে পাচ্ছিনে।

কেন এ দেশে জন্মেছিলাম, বলো? না আত্মহত্যা করব? আমি জানি আমার একার আত্মহত্যাও আঁখির উপর ধর্ষণের না কোন তদন্ত হবে, না কোন বিচার।

তাই আমি বুঝি : আমাদের দেশের বড়ো করুণ অবস্থা চলছে। বড়ো দুর্দশা। এমন অসহায় মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মতো কঠিন আর কিছু হতে পারে না।

তবুও বলবো : নিজে আত্মহত্যা করা কঠিন কোন কাজ নয়। আমাদের শিশু, কন্যা ধর্ষিত এবং নিহত হচ্ছে। কেবল আঁখি নয়। কতো আঁখি এবং নাম জানা-অজানা কতো তরুণী, কতো মেয়ে, এমনকি অসহায় তরুণও।

তবুও এমন দুর্দশার জীবনের উপর বিশ্বাস হারানোর মতো পাপ আর নেই। জীবনের ওপর বিশ্বাস হারানোর অধিকার আমাদের নেই।

তাই মামুনকে কাছে পেলে তাকেও বলতাম, আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, ভালোবাসবো। শতাংশ হিসাবে ৯৯% শতাংশও যদি অমানুষ হয়, হত্যাকারী হয়, ধর্ষক হয়, তবুও মুনতাসীর এবং আমি হ্যাঁ, তবুও, তবুও মুনতাসীর এবং আমি বিশ্বাস হারাবো না। মানুষ হওয়ার এবং মনুষ্য সমাজ তৈরির স্বপ্নকে আমরা পরিত্যাগ করবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শেষ বাক্যে আমরা আবার বলবো : জীবন বনাম মৃত্যুর যে লড়াই আজ চলছে, তাতে জীবনই জয়ী হবে, মৃত্যু নয়।

কারণ জীবনই জয়ী হয় এবং হবে। মৃত্যুই মরবে। মৃত্যুরই মরণ ঘটবে। এ সত্যের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। মৃত্যু বা হত্যা কিংবা অসহায় হিসেবে আত্মহত্যাতেও নয়।

০২.১০.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারপতিও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

গতকাল যদি সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ থেকে থাকে এবং বার হিসেবে সোমবার তাহলে আজ সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ এবং বার হিসেবে মঙ্গলবার। এখন রাত ৮টা পেরিয়ে গেছে। আজকের রোডম্যাপের দিকে কিছুটা তাকানো যায়।

ভোরের কাগজের বিষ্ণু, হারুন, অনু, অশোক, আফসার। ওরা সবাই আমার প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল। ওদের পিছিল ধবল পাথরের সিঁড়ির ধাপের পর ধাপে সাবধানে পা রেখে রেখে একতলা ছাড়িয়ে, দোতলা (দোতলায় একটি ব্যাংকের শাখা আছে) ছাড়িয়ে তেতলা, থেকে শুরু ভোরের কাগজ। আমি তেতলার বার্তায় না গিয়ে আরো একতলা ওপরে চারতলায় যেখানে বিষ্ণু, হারুন, অশোক, অনু ওরা বসেন সেখানে যাই। আমার হাতের লাঠি কাঁপলেও ওরা সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন : আপনার মৃত্যু নেই। আপনাকে আমরা মরতে দেবো না। আমি বলি, একথা যথার্থ। মরতে দিলে আর বেঁচে আছি কী করে! তাই তোমাদের চারতলা পর্যন্ত পায়ে পায়ে হেঁটে উঠেছি। এখন আমার কাছেই বিস্ময়কর বোধ হচ্ছে। কেমন করে এমন হয়? তার জবাবে নিজেই বলি : তার মূল কারণ হচ্ছে, আমি তোমাদের ভালোবাসার ভৃত্য এবং একথাও মানি যে, তোমাদের ভালোবাসা আমার জন্য অবশ্যই একটা ওষুধ বিশেষ। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা অবশ্যই ওষুধ। যদিও বাংলাদেশে তার বড়োই অভাব ঘটছে। দুর্মূল্যের এক ওষুধ। দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে, আজ থেকে কাল, কাল থেকে পরশু। এসব যে আমার মুখের উচ্চারিত শব্দ, তা হয়তো নয়। তবু মুখের উচ্চারণই তো সব নয়। মনের কোন উচ্চারণ নেই?

আজ আমার আসার গরজ একটা ছিল এই যে, গতকাল ওদের পাঠানো আফসার মিয়ার কাছে যে দিনলিপির স্ক্রিপ্টটি পাঠিয়েছিলাম, এই বার্ধক্যে তাতে শব্দের আকার-ইকার ঠিক রাখতে পারিনি। 'মুক্তিযোদ্ধা' লিখতে চাইলেও শব্দটা 'মুক্তিযুদ্ধ' হয়ে ঠেকে গেছে। আর তাই আজ ছুটে গেছি মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযোদ্ধাতে পরিণত করতে। এতেও নিজের মনে হাসি আসে। আকারের ভুলটা কি ভুলে ঘটেছে, না বাস্তব অবস্থা ঘটিয়েছে। যে দেশে মুক্তিযুদ্ধই ঘটেনি (?) সে দেশে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের আবার 'আকারের' কী দরকার?. আর সে সংশোধনে কি আকার সংশোধিত হয়? মূল্যবিহীন শাখা নিয়ে টানাটানি করে কার কী লাভ, না মানসিক না দৈহিক।

এসব কথা আমি বেশ চিন্তাহীনভাবেই লিখতে পারি। একটা শব্দ লিখি তো তারে ১০ মনে করে তার নিচের শব্দ ৯ তারপর ৮। যাকে বলে কাউন্টডাউন : এবং যেতে যেতে শূন্য থেকে মহাশূন্যে।

কিন্তু এসব বাক্যও আবার মনের, মুখের নয়। ছোট্ট একটু ঘরে যে আন্ত রিক্ততায় ওরা কাজ করে চলেছেন, প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে তাতে আমি কোন শব্দ উচ্চারণ করে ওদের কাজে কোন বিঘ্ন ঘটাতে চাইনে।

আমি না বলতেই বিষ্ণু বলল, আপনি এসেছেন স্যার কষ্ট করে। কিন্তু আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। আপনার স্ক্রিপ্টের একটা প্রুফ এসে গেছে। আপনি একটু দেখে দিলে আমাদের খুব সুবিধা হবে। আর ভুল থাকবে না।

: আমি তাইতো এলাম। তোমাদের ধরধরে সাদা কাগজে আমার লেখার প্রুফ দেখতেও ভাল লাগে। এই প্রুফটাই তোমরা ছেপে দিতে পারো না? এমন সাদা কাগজ আর তার মধ্যে কালো মুক্তার মতো বড়ো বড়ো অক্ষর? এটাও আমার মনের কথা, মুখের কথা নয়। আমি হারুনকে বলি, আমার কথায় তোমাদের কাজে অসুবিধা হচ্ছে না তো? হারুন বলে : কই স্যার, আপনি কথা বলছেন কই; চুপ করে আছেন যে! কথা বলুন আপনার কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগে। আমি আবার নিজের মনেই বলি, এই তরুণরা পারেও বটে, আমার মতো বৃদ্ধকে কি অকৃপণভাবে খুশি করে। এদের এমন ভালোবাসার স্বর্গ ছেড়ে যেতে কি ইচ্ছা করে? আজ ভোরের কাগজটা বাসায় যায়নি। একথা বলতে বিষ্ণু একটা কপি আনিয়ে দিলেন। কেবল কপি নয়, আমার জন্য হিসাব থেকে বেশ কিছু টাকারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপর আমার আর থাকার উপায় থাকে না। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে বলি। আর নয়। আজ যাই।

বিষ্ণু বলল, স্যার অবস্থা ভালো নয়, বাসায় যান।

তুমি ভালো বলেছো। বাসার বাধা মানিনি। তোমাদের টানে চলে এসেছি। কিন্তু এখন তোমার পরামর্শ মান্য করে বাসাতেই ফিরে যাবো।

আজ ছিল পঁচাত্তরের জেল হত্যার বিচারের রায় দেওয়ার কথা। কিন্তু ১২টা পর্যন্ত যে খবর এসেছে তাতে রায় দেওয়া হয়েছে—এমন কোন খবর আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষ্ণু বললো, মাঝখানে আমাদের এক কর্মীর পকেট কাটা গেছে সেন্ট্রাল জেলের সামনে জড়ো হওয়া কলহের মধ্যে।

আমি এমন খবর শুনে দস্তুর মতো ভয়ই পেলাম। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এসে একটি রিকশা পেয়ে তাতে করে বাসায় ফিরে এলাম আড়াইটার দিকে। রিকশাওয়ালা কমই নিয়েছে। ২০ টাকার জায়গায় ১৬ টাকা।

আর পাতা খরচ করে কী করবো। বিবিসি ইতিমধ্যে যে খবর দিয়েছে, ঢাকায় জেল হত্যার রায় আজ দেওয়া হয়নি। কারণ রায় যিনি দেবেন সেই বিচারপতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারিখ বদল হয়ে ২১ সেপ্টেম্বরকে ধার্য করা হয়েছে। আবার ২১? ২১ তারিখটাও কি একটা অপয়া তারিখ হয়ে গেলো? তাহলে আমরা কোন তারিখের আশ্রয়ে এই বাংলাদেশে বাঁচবো? সব তারিখই যে আতঙ্কজনক আর রক্তাক্তের আশঙ্কায় ভয়াবহ বলে আগে থেকেই মনে হয়। স্বাভাবিক বলে কি একটা শব্দ আদৌ নেই। একেবারে অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে এই বাংলাদেশে?

৮-৯-২০০৪

দূর ভিয়েনা থেকে এক প্রবাসী বাঙালি বেলা ৪টায় ফোন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা দাবি করে। আমি বলেছি, তিনি যেন তার ঢাকায় অবস্থান করেছেন এমন কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এছাড়া আমি এতোদূরে টেলিফোনে আর কী বলতে বা করতে পারতাম?

কিন্তু এই ফোনের আগে রামপুরার জনতা ব্যাংকে আমার মগবাজারের পানির বিলটি পরিশোধের চেষ্টা এবং ব্যর্থতা গেছে তার কথা একটু স্মরণে রাখার জন্য লিখে রাখি।

দূর সেই রামপুরা যাবো। আর জনতা ব্যাংকের অবস্থান খুঁজে বার করতে এবারো ব্যর্থ হবো, সেই কথাটি মনে না থাকাতেই এই দুর্ভোগ। পায়ের অসুখ ধুয়েমুছে তৈরি হয়ে বার হতেই প্রায় ১২টা বেজেছিল। বাসার কাছেই একটি সিএনজি পেয়েছিলাম। সেই ভরসাতেই রওয়ানা দিলাম। যে সিএনজি আমাকে নামিয়ে দিলো রাস্তার বাঁ পাশে বটে, তবুও জনতা ব্যাংক ছাড়িয়ে প্রায় আধা মাইল পরে তো বটেই। খোঁড়া পায়ে হাঁটি আর জিজ্ঞেস করি, ভাই জনতা ব্যাংকটা কোথায়? এই তো সামনে, দুটো বিল্ডিং পেরুলেই এই ডানের সাইডেই পাবেন।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে করতে যখন জনতা ব্যাংকের দোতলায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ভিড় ঠেলে উঠলাম তখন ব্যাংকের ১টা বেজে গেছে। বেজে যখন গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আর কী করা। সিএনজিকে তো ৫০ টাকা দিয়ে দিয়েছি। এখন বাসায় ফিরে যেতে আর এক ৫০ তো লাগবেই। তাই লেগেছিল। মোট ১০০। কিন্তু তার শোকে থাকলে তো চলবে না। বিল তো দিতে হবে। বড়ো ছেলের বিল। কিন্তু সে যদি দেওয়ার মতো স্থির মনের হতো তাহলে তো আমার কোন উদ্বেগ ও চিন্তারই কারণ থাকতো না। কিন্তু সে কথাও থাক। ঠিক করেছি আগামীকাল মানে ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় যেমন করে হোক না কেন, বাসা থেকে বেরিয়ে পড়বো। জনতা ব্যাংকটা আবার বার করতে হবে। বিরাট লাইনে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াবো এবং যদি বিলটা দিতে পারি ও বেঁচে-বর্তে এই বাসাটিতে ফিরতে পারি তাহলে খুশি মনেই লিখবো : সব কষ্টেরই লাভ আছে। কেবল লোকসান বলে কিছু নেই। আজো যেমন জনতা ব্যাংক থেকে যে রিকশাচালক, আমারই মতোই বৃদ্ধ, তবু তার রিকশা চালিয়ে প্রথমে নিয়ে এলেন মৌচাকে। পথে দু'একবার একটু সাবধান হতে বলতেই পক্বকেশ রিকশাচালক বললেন, 'ডরাইয়েন না সাহেব। আমি ৩০ বছর যাবৎ এই ঢাকাতে রিকশা চালাইতেছি।' এরপর তাকে আমি আর কিছু বলিনি। মৌচাক থেকে যে মিশুকটি জোগাড় করতে পেরেছিলাম তার চালক, যুবকটিও বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। রিকশাকে মৌচাক পর্যন্ত দিয়েছি ১০ টাকা। পরে মিশুককে দিয়েছে ৪০ টাকা। যুবকটিকে ভালো লাগাতে বললাম, কাল যদি এদিকে ৯টার সময়ে আসেন তাহলে এই বাসার দোতলা থেকে আমাকে ডাক দিলে আমি আপনাকে নিয়ে আবার একটু জনতা ব্যাংকে যাবো। রামপুরা বাজারের কাছে, ডানপাশের পেট্রোল পাম্পের উল্টোদিকে। দেখলাম ছেলেটি যথার্থই চেনেন। আজকের সিএনজিওয়ালা চেনে না বলেই আমার দুর্ভোগটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেখা যাক। কাল কী হয়।...

০৯.০৯.২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি সেলুকাস!

আজ অনেক কষ্ট করে বাসা থেকে বেরিয়ে ফার্মগেটের রাস্তা পর্যন্ত রিকশায়, তারপরে রিকশা থেকে নেমে এ বেবি, সে বেবি, এমনকি ট্যাক্সিক্যাবের সব ক'টিকে বললাম : টিকাটুলি মহিলা কলেজ এলাকায় যেতে। কিন্তু সকলেই ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে, কিন্তু রাজি হয় না।

আমি বলি : ভাই যা চাইরেন, তাই দেবো। কিন্তু যাবেন না কেন? তাহলে রাস্তায় বেরুন কেন? না, গরম মেজাজে নয়, অনুনয়-বিনয়ের ভঙ্গিতে বলি। কিন্তু প্রত্যেকটির এক জবাব : না, সাহেব ওদিকে যাবো না।

ওদিকের কি দোষ বুঝলাম না। কিন্তু তার কৈফিয়ৎ তলব করার আমার সাহস হল না।

যাক, শেষে একটি সিএনজি বেবি দয়া দেখাল। বলল : ১০০ টাকা লাগবে। আমার তো রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। প্রায় সব মূল রাস্তা থেকেই রিকশা তুলে দেয়া হয়েছে। এখন ভরসা কেবল বেবি আর ট্যাক্সি। বাসে চড়ার কথা পঙ্গু আমি তো কল্পনা করতে পারিনে।

AMARBOI.COM

তাই সেই ১০০ টাকা কবুল করেই বেবির সিটে উঠে বসলাম। এ বেবিওয়ালা একটু এগিয়ে সামনের জ্যামে দাঁড়িয়ে বলল : বুঝেন ঠ্যালা। রিকশা উঠিয়ে দেয়। আমাদের বেবিতে গ্যাস দেয় না। আবার রাষ্ট্র চালায়। বুঝবে এর ঠ্যালা। আপনারা বুঝেন এবার।

আমি বলি : আমি সে লোক নই। আমি আপনাদের অসুবিধার কথা বুঝি। এ রাজত্বে কোন আইন আর বুঝ, বিবেচনা বলে কিছু নাই।

বেবিওয়ালা একটু নরম হয়। বলে, না আপনার কথা বলছি না।

যাক, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল পৌঁছতে টিকাটুলির অভয়দাস লেনের মেয়েদের ইউনিভার্সিটিতে। এর আগের দু'দিন ঠাণ্ডার দাপটে আসতে পারিনি। বেগজাদী আপার সঙ্গে দেখা হল। ফরিদার সঙ্গেও। ক্লাসে কিছু ছাত্রী এসেছিল : অনার্স,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব, এবং দ্বিতীয় পর্ব এমএর। এরা হয়ত শহরের দক্ষিণ আর পূর্ব অঞ্চল থেকে আসে। আর এদিকে পুরনো ঢাকায় রিকশা চলাচল বন্ধ করেনি। মেয়েদের ক্লাস নিতে সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছিল। গেটের জালালকে বললাম : দেখো, পশ্চিম রাজাবাজারের জন্য একটা বেবি পাও কিনা। সে নানা দিক ঘুরে এসে বলল : না, স্যার, কোন বেবি পাইলাম না। একটা রিকশা ডাকব?

: ডাকো, রিকশাকে বলবা : সামনে খালি বেবি যেখানে পাবে সেখানে আমাকে বেবিতে তুলে দেবে। রিকশা যা চাইবে আমি তাকে তাই দেব।

এইভাবে আমি প্রায়ই করি। আজো এই রিকশা নিয়ে ইত্তেফাক মোড় ঘুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে এগুতে একটি বেবি খালি দেখে তাকে বললাম : যাবেন, পশ্চিম রাজাবাজার? সে আপত্তি করল না। বলল : ৭০ টাকা। আমি তাতেই রাজি হলাম। আর রিকশাকে দিয়ে দিলাম ৮ টাকা। তাতে মোট দাঁড়াল ৭৮ টাকা। তবু সকালের ১০০ টাকার চাইতে কিছু কম।

এমনি করে আমাকে আমার চলাচল ম্যানেজ করতে হয়। ঘরে বসে থাকলে আমাকে কে মনে রাখবে, কে আমাকে খাতির করবে? আমার মত বিত্তহীন মধ্যবিত্তের কষ্ট করা নিয়ে আফসোস করে বিলাসিতার উপায় নাই।

পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় পৌঁছলাম প্রায় পাঁচটায়। আগামীকাল জা.বি.র দিন। ভাবছি, কাল যাবো কিংবা যাবো না? দেখা যাক। আগে আজ রাতটা বাঁচি, তবে তো।...

বিবিসি'র খবর শুনেছি : আমেরিকার ইরাক নিয়ে সেই কানামাছি খেলার কথা। তা বাদে উদ্বেগের খবর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা শহরে পর্যন্ত দাবানলের বিস্তার ঘটছে। মৃত্যু হয়েছে কয়েকজনার। বাতাসের প্রচণ্ড বেগ। আমাদের ছেলে তিতু, বউ দিনা আর ওদের বাচ্চা অন্তরা এখন অস্ট্রেলিয়ায়। গেছে তিন মাস আগে। অস্ট্রেলিয়া তো মহাদেশ। তায় ওরা আছে সিডনীতে। ক্যানবেরায় নয়। কিন্তু এই দূরে বাবা-মার কাছে, যাহা ক্যানবেরা, তাহা সিডনী। ওরা আমাদের চিঠি দিয়ে এবং ফোন করে জানিয়েছে, ক্যানবেরা থেকে সিডনী অনেক দূরে। তোমরা আমাদের জন্য চিন্তা করো না। ওদের এমন জবাবে মন একটু শান্ত হয়। তবুও এই দাবানল মানে কি, তাও জানিনে, আর তা থেকে কে বাঁচবে, আর বাঁচবে না, তাও বুঝিনে।

২০.০১.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাণ্ডার ডিগ্রী মাপিনি। তবু মনকে বলছিলাম : আজ জা. বি. যেতে পারব না। কর্তব্যপরায়ণ মাইক্রোবাস চালক মোহসিন একটু দেরি করে হলেও এসেছিল। দরজার কড়া নাড়ল। আমি দরজা খুলে বললাম : আজ থাক। সামনের দিন একটু আসবেন। মোহসিন সালাম দিয়ে চলে গেল।

ঠাণ্ডার প্রকোপটা টের পেলাম দুপুরের দিকেই। ঘন কুয়াশায় অন্ধকার। সূর্য উঠেছে কি না, তা বুঝতে পারলাম না। গতকাল পর্যন্ত ভাবছিলাম, ঠাণ্ডাটা হয়ত একটু কমের দিকে। কিন্তু আজকের অবস্থায় আর বুঝতে পারছিনে, কবে পর্যন্ত একটু স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় নামতে পারব।

বাইরের চাইতে ঘর ঠাণ্ডা। সেই হিম-ঠাণ্ডা ঘরে বসে কি করব। স্ত্রী কলি তার টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে কোলকাতার ছবি দেখতে চাইল তো, দেখল দূরদর্শন থেকে সাক্ষাত সম্প্রচার হচ্ছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি, ফকিরের মত সিধা সিঁথিকাটা, আর লম্বা বাবরি চুলওয়ালা ড. আব্দুল কালামের কোলকাতা আগমন এবং কোলকাতার কোন্ একটি প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে বিস্ময়কর ঘনিষ্ঠতায় বক্তৃতা দান, বোর্ডে দেশের উন্নয়নের জটিল তত্ত্বের এবং তথ্যের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নকশার উদাহরণ ব্যাখ্যা করে, সামনের প্রায় হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে এবং তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে, এ কোণ থেকে ও কোণের কাউকে ডেকে বললেন : তুমি প্রশ্ন করো আমাকে। ছাত্র ইতস্তত করলো যে তাকে বাধ্য করলেন প্রশ্ন করাতে।

AMARBOI.COM

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। কোথায় লাগে সুচিত্রা-উত্তমের পুরনো 'দীপ জ্বেলে যাই' বা অমনি কোন চিরায়ত তথা ক্লাসিক চলচ্চিত্র?

মিনিট গিয়ে ঘণ্টা কাটল। রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম কোন লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন না। মাঝে মাঝে সিঁথির টান আর দুপাশের ঝুলে পড়া চুলের রাশ ঠিক করে করে তাঁর একেবারে নৈরাষ্ট্রিক পদবিহীন এক শিক্ষকের ক্লাস চালাতে লাগলেন।

ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আমরা দু'জনে দুপুরের খাবার খেতে পারছিলাম না। আব্দুল কালামকে রেখে খাই কি করে?...

এই অবস্থায় মনে পড়ে গেল, ডিএল রায়েরই বোধহয় সেই 'চন্দ্রগুপ্ত' নামের নাটকের মধ্যে যুবক আলেকজান্ডারের উচ্ছ্বসিত বাক্যকে। একটি সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, চারদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে সেনাপতি সেলুকাসকে ডেকে আলেকজান্ডার বলল : সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র এই ভারতবর্ষ!...

২১.০১.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেন্টাগন, সিআইএ; কি বস্তু?

সকালেই একটু বসলাম খাতা-কলম নিয়ে। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। ক্ষুদ্র অক্ষরের ছাপানো লেখা একেবারেই পড়তে পারি না। কিন্তু শেষ যাবার আগে চোখ কাটাছেঁড়ার হাঙ্গামাতে কি লাভ? বর্তমান মুহূর্তে এই পৃথিবী নামক গ্লোব তথা গ্লোবীয় গ্রামটাতে জীবিত থেকে কি লাভ? আর পালাবই বা কোথায়?

সারা রাত বোধ হয় ঘুমই হয়নি। চেতনে-অবচেতনে কেবল আউড়েছি : পেন্টাগন, সিআইএ, পেন্টাগন, সিআইএ? বুশকে তবু আমাদের ঢাকার রাস্তাঘাটেই গলায় রশিবাঁধা অবস্থায় এ গাছে, সে গাছে, বিদ্যুতের খুঁটির সাথে ঝুলে থাকতে দেখি। দেখে মনে যেন একটু আনন্দ হয়। অসহায়ের আনন্দ।

কিন্তু কে এই পেন্টাগন আর সিআইএ। সিআইএ : তিনটি ইংরেজি অক্ষর। তাকে ভেঙ্গে বলা যায় : সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এই গ্লোবের প্রতি ইঞ্চি জায়গার প্রতিটি মানুষের ঠিকুজি, কুষ্টির খবর যোগাড় করে তাদের নথিবদ্ধ করে রাখে। তাদের দরকার মতো নিকেশ করার জন্য। অসহায়ের একটা স্তোক কথা আছে : রাখে আল্লাহ, মারে কে? কিন্তু আজকের পৃথিবী সব জায়গায় সব মানুষের, প্রত্যেকটা ভয়ার্ত মানুষের চিন্তা হচ্ছে : মারে সিআইএ রাখে কে?

তা তো বুঝলাম। কিন্তু পেন্টাগন কে? কে তিনি? একটা ইংরেজী অভিধানেও কি পাওয়া যাবে না? হাতের কাছে ইংরেজী কোন এনসাইক্লোপিডিয়া নেই। কিন্তু ইংরেজী অক্সফোর্ড ডিকশনারি দু'একখানি যোগাড় করেছি। মোতাহারের কাছ থেকে যে দু'খানি সাম্প্রতিককালে যোগাড় করেছি, তার দাম এখনও দিতে পারিনি। তারই দু'খানিকে বইয়ের স্তূপ থেকে বার করে এই সাতসকালে খুঁজতে লাগলাম, দেখি পেন্টাগন পাই কিনা। একেবারে যে পাওয়া গেল না, তা নয়। কিন্তু একটিতে পাওয়া গেল শব্দটির একটি জ্যামিতিক অর্থ। পেন্টাগন মানে : পাঁচটি সোজা বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র। কিন্তু এ তো জ্যামিতিক শব্দ। এর উপর আমাদের তথা পৃথিবীর এত ক্রোধই বা কেন, আর এর রহস্যই বা কি? আমার মতো মূর্খের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা বলা ভাল, আমি মূর্খ আমি এর অর্থ ভেদ করব কেমন করে? তবু চেষ্টা ছাড়লাম না। আর একটি ভারি অক্সফোর্ডের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। সেখানে একটু পেলাম। রহস্যের প্রায় কাছাকাছি যাওয়া গেল। যাতে পেন্টাগনের উপর আমার মনেও কিছুটা ক্রোধের সৃষ্টি হলো। সেই অক্সফোর্ডের কয়েকটি বাক্যকে ইংরেজিতেই প্রথমে এই খাতার পাতায় তুললাম :

"PENTAGON PAPERS : An official study of U.S. defence policy commissioned in 1967 to examine U.S. involvement in South East Asia. Leaked by a former government employee, they revealed miscalculations, deceptions, and unauthorised military offensives. Their publication provoked demands for more open government."

বাক্য বেশি নয়। কিন্তু এই-ই যথেষ্ট নয়। আমাদের রাজনৈতিক পণ্ডিত আর অধ্যাপকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা আর একটু বিস্তারিত করে এই 'রক্তকরবী'র রহস্য রাজার কর্মকাণ্ডকে একটু সহজ বাংলায় অসহায় মানুষ আমাদের সামনে তুলে ধরুন। এটি তাঁদের জন্য একটি দেশপ্রেমিক কর্তব্য।

আমি ইংরেজী বাক্য কয়টির অনুবাদ বা মর্মার্থটিকে বাংলাতে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম : 'পেন্টাগন পেপারস : পেন্টাগনের গোপন দলিল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নীতির উপর ১৯৬৭ সালে গঠিত একটি কমিশন। উক্ত কমিশনের উপর দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করণীয় বিষয়ের নীতি নির্ধারণ। এই কমিশনের রিপোর্ট কখনও প্রকাশ করা হয়নি। কেবল একজন বিবেকবান সরকারী কর্মচারী তার কিছু তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। সেই তথ্যে প্রকাশ পায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে সব ষড়যন্ত্র করেছে তার মধ্যে যেমন ছিল নানা ভ্রান্ত ধারণা, তেমনি প্রতারণা এবং অবৈধ সামরিক আগ্রাসন। এই তথ্যের ফাঁস জনসাধারণের মধ্যে সরকারী কর্মকাণ্ডে অধিকতর প্রকাশ্য নীতি গ্রহণের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।'

আমার কেবল একটি আত্মপ্রশ্ন : আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, না দক্ষিণ গোলার্ধের অগম্য প্রত্যন্তে?

২১.০৪.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন মহৎ শিল্পীরই মৃত্যু নেই

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সম্মাননা অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রীতিভাজন মামুনুর রশীদ, প্রধান অতিথি আমাদের শ্রদ্ধেয় হেনাদি, আলোচক সুহৃদবৃন্দ এবং প্রীতিভাজন সকল শিল্পী এবং কর্মীবৃন্দ : আমার কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন।

আমি নাটকের লোক নই : নাটকীয়ও নই কোনভাবে। তবু কেন যে আপনারা আমাকে ভালবাসেন, সে রহস্যের উন্মোচন আমি আজও করতে পারিনি।

কিন্তু একটা কথা আমি স্বীকার করি; যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁদের কোন দাবিকে না বলার আমার শক্তি নেই।

আপনারা এসএম সোলায়মানের নির্বাচিত নাটকের একখানি অনুপ্রেরণাদায়ক সঙ্কলন তৈরি করেছেন। এই সঙ্কলনটিকে আপনারা আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি অভিনেতা নই। সংস্কৃতি জগতের অন্য কোন শিল্পীও আমি নই। তবু আমার এই বাংলাদেশের সংস্কৃতিজগতের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে নাটক তথা নাট্যজগত।

আমি এ কথা বুঝি, কল্পনাতীত যে সঙ্কটের মধ্যে, সমগ্র গ্লোবের সঙ্গে, আমরা নিপতিত, তাতে সর্বক্ষণই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে বর্বরতার আঘাত থেকে একটু বাঁচিয়ে রাখার কুশীলব হচ্ছেন আপনারা : নাটক, তথা নাট্য লেখক, নাটক মঞ্চায়ন আর সেই জটিল মঞ্চায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হাজার না হোক, শত শত উপাদান : আমি বলি সংখ্যাহীন কুশীলবরা। একজন দক্ষ অভিনেতা এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের ক্ষেত্রে যতখানি মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়, তেমনি এই প্রক্রিয়ার একজন আলোক প্রক্ষেপণ এবং নিয়ন্ত্রণকারী, নাট্য হলটিতে দর্শকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মী : তিনি, অপর যে কোন অভিনেতা বা অন্য কোন কর্মীর মতোই মূল্যবান এবং বিকল্পহীনভাবে অনিবার্য। মোট কথা একটি নাটক মঞ্চায়নের মতো সংখ্যাহীন কুশীলবের এমন যৌথকর্ম, আমি বলব, এমন প্রতিষ্ঠানের কথা আমি কল্পনা করতে পারিনে। আপনাদের সকলকে তাই আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রিয় মামুন ও তাঁর সঙ্গীদের এর পূর্বেও বলেছি, আমাদের মহৎ সংস্কৃতি সৃজনের ক্ষেত্রে দেশের ভেতরের এবং বাইরের যে সব অপশক্তি দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছি তার মধ্যে আমার মতো অসহায় মানুষ যা একটু বেঁচে রয়েছি তার একমাত্র উৎস হচ্ছে বাংলাদেশের নাট্যজগত এবং তার কুশীলববৃন্দ।

আমি আর ভারী কথায় যেতে চাইনে, তার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। কিন্তু একটি নাটক কেমন করে তার একজন দর্শককে জীবন দিতে পারে, তাকে উদ্দীপিত করতে পারে, কেমন করে তার আত্মার বিশ্লেষণে তাকে নিবদ্ধ করতে পারে, তার কথা একটি ঘটনায় বলেছেন অবিস্মরণীয় লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী।

ম্যাক্সিম গোর্কীর কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। আর আন্তন শেকভকেও নয়।

ম্যাক্সিম গোর্কী আন্তন শেকভের 'আঙ্কল ভানিয়া'র মঞ্চায়ন দর্শন করে যেমন গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন, তার প্রকাশে তিনি আন্তন শেকভকে যে পত্রটি লিখেছিলেন তার কয়েকটি ছত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়ে আমি আমার এই দীন প্রকাশের ইতি টানতে চাই।

জীবনকে গোর্কী ভালবেসেছিলেন। 'শ্রম' ছিল তাঁর দেবতা। ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষমতা, অক্ষমতা নিয়েই মানুষ। মানুষকে তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কিন্তু তার জীবনদর্শনের যেটা বড় কথা, সে হচ্ছে এই যে, এই দেখাতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনাই হচ্ছে বড় কথা। তাই হচ্ছে মানুষের জীবন। ব্যক্তি মানুষ, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দিনদিনান্তের মানুষ।

... গোর্কী আন্তন শেকভকে লেখা তাঁর পত্রে বললেন, সাহিত্যিকের কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিকে নাড়া দেয়া, যেন সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চার দেয়ালের বাইরে আসতে পারে, নিজেকে অতিক্রম করে দূর থেকে নিজেকে দেখতে পারে, ঘৃণা করতে পারে, ভালবাসতে পারে, আর পারে নিজের আত্মার জন্য সংগ্রাম করতে।

গোর্কী যেন জীবনদর্শনের এক পরম সাথী পেলেন অবিস্মরণীয় মহৎ শিল্পী আন্তন শেকভের মধ্যে। শেকভকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাঁর অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে, তাঁকে ভালবাসতেন শিশুর মতো দ্বিধাহীনভাবে। পারস্পরিক পত্রবিনিময়ের কত চিহ্ন ভরে যাচ্ছে গোর্কীর জীবনে। গোর্কী দেখলেন, অদ্ভুত মানুষ এই শেকভ। নাটকে তিনি মানুষের জীবন নিয়ে নাটকীয়পনা করেন না। তাঁর নাটকে মানুষের জীবন যেমন, তেমনি ভেসে ওঠে।...

১৮৯৬ সালে শেকভের নাটক 'আঙ্কল ভানিয়া' দেখে গোর্কী লিখেন শেকভকে : প্রিয় আন্তন পাভলোভিচ, আপনি আমার চিঠির জবাব দিয়েছেন এবং বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আমাকে লিখবেন। এ জন্য আপনি আমার অপরিসীম ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন।... আপনার এই নাটক কি গভীরভাবে একজন দর্শককে আলোড়িত করে তুলতে পারে। আঙ্কল ভানিয়াকে আমি যত দেখতে লাগলাম, ততই যেন আমার মনে হতে লাগল, কে যেন একটা ভোঁতা করাত দিয়ে নির্মমভাবে আমার সত্তাকে দিখণ্ডিত করে চলেছে। করাতের দাঁতগুলো আমার মুখের মাঝখানটাতে বসে যাচ্ছে। নিচে অন্তরটা যেন বেদনায় শিউরে উঠছে, ডুকরে কাঁদছে আর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার কাছে আপনার আঙ্কল ভানিয়া দুর্দান্ত এক ভয়ানক সৃষ্টি বলে বোধ হয়েছে। নাট্যশিল্পের এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। মানুষের ফাঁকা মস্তকের উপর হাতুড়ির কি নির্মম আঘাত।...

আমাদের বিপ্লবী নাট্যকার এসএম সোলায়মানকে আমি দেখিনি। সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাঁর নির্বাচিত নাটকের সঙ্কলনখানিতে ভূমিকা হিসাবে যে কথা আপনারা ব্যক্ত করেছেন, 'একটি অসমাপ্ত গানের বেদনা' বলে, মামুনুর রশীদ যে অনুভূতির প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের জীবনের এই পর্যায়ে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করছে। সোলায়মানের মৃত্যু নেই, অমিত সম্ভাবনাময় এমন শিল্পীর মৃত্যু হতে পারে না। আজ এই অনুষ্ঠানটিতেও তিনি তাঁর স্বআরোপিত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমন মহৎ ঐতিহ্যের আমরা যারা উত্তরাধিকারী তাদের যে কোন সঙ্কটে, সাহস হারা নিঃসহায় বোধ করার কোন কথা আমি চিন্তা করতে পারিনে।

AMARBOI.COM

আপনাদের থিয়েটার ফেডারেশনের সৃষ্টিকর্মের জন্য যেমন, তেমনি বাংলাদেশের সকল নাট্যোদ্যোগ এবং নাট্যকর্মের জন্য আমি গৌরব বোধ করি।

জয় হোক আমাদের সকল মহৎ নাট্যপ্রয়াসের, সকল নাট্যকর্মীর : জীবনদানের এবং আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তরে নতুন প্রাণ সৃষ্টির মহৎ উদ্যোগের।

এমন একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার বোধ হচ্ছে, যেন আমরা একটি পরিবার।

আমরা স্বপ্ন দেখব যেন আমাদের দেশটিকে এমনি একটি পরিবারে আমরা পরিণত করতে পারি। কেবল তাই নয়, যেন আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজ'কে একটি প্রীতিপূর্ণ গ্রামে পরিণত করতে পারি।

আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা পুনরায় গ্রহণ করবেন।

তারও পূর্বে আমার আর একটি কথা : আমি আগে জানতাম না, আপনারা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে জানিয়ে দিলেন : বিস্ময়কর নাট্যকার সোলায়মান কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অনুজ নয়। আমার সন্তানবৎ, পুত্রপ্রায়। আপনারা বলেছেন চট্টগ্রাম কলেজের পাঠ শেষে সোলায়মান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। আমার ব্যক্তিগত কথা : আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক। আপনাদের এমন আকস্মিক খবরে অনুভূতি প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তাই বলি, আমার কেবল অনুজ নয়। আমার পুত্রবৎ, আপনাদের এই সোলায়মান : আর এমন পুত্র, যে তার পিতাকে অতিক্রম করে যেমন আপনাদের মনে অমর স্মৃতি হয়ে আছে, তেমনি সে আজ আমার নিঃসীমে বিলয় হওয়ার আসন্ন মুহূর্তে আজ এই অনুষ্ঠানে সম্যক উপস্থিত থেকে আমাকে নতুন আর এক জীবনদানে ধন্য করে গেল। জয়োস্তু স্নেহভাজন সোলায়মান : জয় হোক স্নেহভাজন সোলায়মানের।

০৮.০৫.২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিশ হাজার বছর পরে

মহৎ কোনো চিন্তার সাক্ষাৎ পেলে চিন্তাটি কার সে প্রশ্নের চাইতে, বড়ো হচ্ছে চিন্তার মহত্ত্বটি। মহৎ সত্যের যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমনি মহৎ চিন্তার মালিকানা নিয়েও বিরোধের কোন হেতু নেই। কথাটি আমার আজকের চিন্তাপ্রণালির ক্ষেত্রেও সত্য।

সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, এ কথা শুনতে শুনতে ভাবলাম, দেখি না ব্যাপারটার ওপর আর খানিকটা ভাবনা করে।

চিন্তা : সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে

অভিধানেই যাওয়া যাক। অভিধানের সার সংজ্ঞার একটি মূল্য আছে। তাই সমাজতন্ত্রের অভিধানগত সংজ্ঞাটি তুলেই শুরু করছি :

'সমাজতন্ত্র' : সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হিতার্থে (ভূমি ও কলকারখানা প্রভৃতি) উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত : এইমতবাদমূলক শাসন ব্যবস্থা : socialism- সংসদ বাঙ্গালা অভিধান।

যার কোন বিকল্প নেই, সে কারুর কাছে ভালো কিংবা মন্দ; যা বলেই বিবেচিত হোক না কেন, তাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা অহেতুক পরিশ্রমেরই ব্যয়। এর অপর কোন সার্থকতা নেই।

অবশ্য অনিবার্যকে নিবারণ করার চেষ্টা করে তারা, যারা সেই অনিবার্যের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন বোধ করে। অপরদিকে যারা সেই অনিবার্যকে নিজেদের জীবনের ও সংগ্রামের পরিণাম হিসেবে দেখে, তারা তাকে নিবারণের চেষ্টাতে স্বাগত জানাতে চায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হেগেলের এরূপ উক্তিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায় যে, 'বুদ্ধিমানেরা ইতিহাসের সঙ্গে যায়, নির্বোধকে ইতিহাস টেনে নেয়।'

সমাজতন্ত্র কাকে বলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানান জনের নানান ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যার পূর্বে মূলকে মানতে হবে। সমাজই মূল। সমাজ থেকে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে, হয়েছে এবং হবে। রাষ্ট্রীয়করণ, বিরাষ্ট্রকরণ, যৌথকরণ, অযৌথকরণ, ব্যক্তিগত মালিকানা : তার পরিমাণ ও সীমা, নিয়ন্ত্রণহীন বাজার, নিয়ন্ত্রিত বাজার : ইত্যাদি। দেশ ও কালনির্বিশেষে এর কোন অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞা বা ধার্যকৃত চরিত্র থাকতে পারে না। কিন্তু কাল থেকে কালে, আর দেশ থেকে দেশে এই সব সমস্যা ও তার বিভিন্ন সমাধান চেষ্টা সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতাকে নাকচ করতে পারে না।

গ্রিক পণ্ডিত এ্যারিস্টটল বলেছেন : 'মানুষের রাষ্ট্রের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষের রাষ্ট্র হচ্ছে, মানুষের সমবায়ে সংগঠিত একটি সংস্থা।

এই সমবায় ব্যবস্থা চার হাজার বছর পূর্বে কিরূপ ছিল তার গবেষণা মার্কস-এঙ্গেলসও শেষ করেননি। তাঁরা বলেছেন : মানুষের ইতিহাস যতোটুকু আমরা জেনেছি, তার লিখিত ইতিহাস, তাতে আমরা অনুমান করি, আদিতে মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমবায়গত জীবনযাপন করতে হয়েছে। সেটা কোনো আদর্শ অবস্থা নয়। তা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু মূল তো, তথা মানুষের সমাজ, তার ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে সমবায়ী হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এবং সে কারণেই তারা বলেছেন, মানুষের শেষহীন অভিযাত্রায় মানুষকে ক্রমাধিক পরিমাণে সমবায়ী সমাজ তৈরি করতে হবে। এই স্বপ্ন মানুষকে দেখতে হবে। এই স্বপ্নই তার চালকশক্তি। এই অভিযাত্রায় তার হাজার উঠতি-পড়তি, আগমন-পশ্চাত হটা ঘটবে। তবু মানুষ এগিয়ে যাবে।

সাম্যবাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের দূর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হয় না। গরিব-ধনী প্রত্যেকটি পরিবারই সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পরিবার। ছোট-বড়ো, মা-বাবা, ভাই-বোন, অক্ষম-সক্ষম : সকলকে নিয়ে যে পরিবার, সে পরিবারের নীতি হচ্ছে : From each, according to his capacity, to each according to his necessity : প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতামত গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমত প্রদান।

মার্কস-এঙ্গেলস স্বপ্ন দেখেছিলেন, পারিবারিক এই সাম্যবাদী নীতি একদিন সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। সমগ্র মানবসমাজই একটি পরিবারে পরিণত হবে। যে মনুষ্য পরিবারের পরিচালনার স্বাভাবিক নীতি হবে : প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতানুযায়ী গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ পরিবারের মধ্যে যে নীতি সর্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত কিন্তু মনুষ্যসমাজের বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণে যে নীতি অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত, সে নীতি মনুষ্য সমাজের সম্পদ ও শক্তির বিপুল বিকাশে সেই দূর একদিন পরিবারের ন্যায় সর্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত হবে।

এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে? মার্কস-এঙ্গেলস আমাদের এই স্বপ্নের মুক্তিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর কাছে আমরা তাই ঋণী।

মানুষের ভবিষ্যতের সেই দিন কবে? মার্কস যদি সেই দিন সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। আর সে ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবে সত্য না হয়েও থাকে, তবু মনুষ্য সমাজের সামনে যে স্বপ্নকে তারা তুলে ধরেছেন, সে স্বপ্নের মৃত্যু নেই।

স্বপ্নের সেই দিন কবে? আমি বলবো 'ত্রিশ হাজার বছর' পরে মানুষের জীবনে সেই দিন প্রায় আসন্ন হয়ে আসবে, যেদিন মানুষের সমাজ অদ্যকার চাইতে অধিকতরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, সাম্যবাদের কোনো বিকল্প নেই। আদিম সাম্যবাদ যদি প্রাকৃতিকভাবে অচেতন এবং বাধ্যতামূলক ছিল, তো ভবিষ্যতের সাম্যবাদ হবে মানুষের যৌথ এবং সচেতন স্বেচ্ছামূলক জীবনাচরণেরই প্রকাশ।

এ হচ্ছে দূরের কথা। দূরদৃষ্টির কথা। কাছে অবশ্য অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ব্যাখ্যা, অনেক রাশিয়ার পতন উত্থান, অনেক রিগান-বুশের যাওয়া এবং আসা। অনেক হ্যাঁ, এবং না। জোয়ার এবং ভাটা এই দ্বন্দ্ব, উত্থান পতন হ্যাঁ এবং না'র বৈচিত্র্যও সমাজে দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তর তত্ত্বের (dialectical transformation of society) সত্যতারই সাক্ষ্য বহন করে, তার শূন্যতার নয়।

সমাজের দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে আজ যারা মিথ্যা বলে নাকচ করার চেষ্টা করছে, তারা তাদের সেই চেষ্টার মাধ্যমেই দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। মার্কসবাদ বলে যদি কিছু থাকে, তবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তাও মার্কসবাদের অঙ্গীভূত। পক্ষ-বিপক্ষের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ বিকশিত হয়ে এসেছে।

মার্সকবাদের পক্ষে-বিপক্ষের দ্বন্দ্ব বর্তমানে যেরূপ দেশে দেশে ব্যাপ্ত ও বিস্তারিত, ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মার্কসবাদের সবলতারই পরিচায়ক। দুর্বলতার নয়।

আজকের পৃথিবী ক্ষুদ্র বটে। আবার বিচিত্ররূপে বৃহৎও বটে। রাশিয়ার ব্যাপার যেমন রাশিয়ার ব্যাপার, তেমনি আমাদেরও ব্যাপার। আমেরিকার ব্যাপার যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার ব্যাপার, তেমনি আমাদের ব্যাপার। যেমন বাংলাদেশের, তেমনি পৃথিবীরও। আবার এও সত্য যে, রাশিয়ার ব্যাপারে আমাদের ব্যাপার হলেও রাশিয়ার কোন সরকার বা ব্যবস্থা ডুবলে বা আদর্শগতভাবে ব্যর্থ হলে আমাদের ডুবতে হবে কিংবা আদর্শগতভাবে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে হবে, তেমন কোন স্বতঃসিদ্ধ কথা নেই।

২৩.১২.২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~